ইমাম বান্নার পাঠশালা

ব্যক্তিত্ব ও সমাজ বিনির্মাণে
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াত পদ্ধতি

ড. ইউসুফ আল কারযাভী
অনুবাদ : জাকিয়া সুলতানা শিফা

ইমাম বান্নার পাঠশালা

التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

ইমাম বান্নার পাঠশালা

ব্যক্তিত্ব ও সমাজ বিনির্মাণে
ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াত পদ্ধতি

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ

জাকিয়া সুলতানা শিফা

প্রচ্ছদ প্রকাশন

www.bjilibrary.com

ইমাম বান্নার পাঠশালা

মূল : ড. ইউসুফ আল কারযাভী

অনুবাদ : জাকিয়া সুলতানা শিফা

প্রকাশনায়

প্রচ্ছদ প্রকাশন

৩৪, নর্থব্রুক হল রোড, মাদরাসা মার্কেট (২য় তলা)

বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

০১৭৮১-১৭২০২৬, ০১৩১৫-৩৭৩০২৫

prossodprokashon@gmail.com

fb/Prossod Prokashon

www.prossodprokashon.com

প্রথম প্রকাশ : মে, ২০২২

অনুবাদস্বত্ব : প্রচ্ছদ প্রকাশন

সম্পাদনা : শাহমুন নাকীব, সাইফুল্লাহ

প্রচ্ছদ : আবুল ফাতাহ মুন্না

একমাত্র পরিবেশক : একাত্তর প্রকাশনী

প্রকাশনা ক্রম : ৪৩

মূল্য : ২৭০/- (দুইশত সত্তর টাকা)

IMAM BANNAR PATHSHALA

by Dr. Yusuf Al-Qaradawi

Translated by Jakiya Sultana Shifa

Published by Prossod Prokashon

ISBN: 978-984-96714-0-4

www.bjilibrary.com

সূচিপত্র

ভূমিকা ০৯

নবপ্রজন্ম গঠনে ইখওয়ানের সফলতার কারণ ১১

তালিম-তারবিয়াতের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ ১১

সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত লক্ষ্য ১১

ইসলামি জীবন গঠনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি ১২

আল্লাহভীরু নেতৃত্ব ১২

মুখলিস ও আমানতদার দক্ষ প্রশিক্ষক ১৩

যুগোপযোগী ও বিচিত্র উপকরণ ১৩

প্রথম অধ্যায় : **রাব্বানিয়্যাত** ১৬

অন্তরের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা ২০

অন্তরের খোরাক ২৬

এক. সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদআত বর্জন ২৭

দুই. ফরজসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব ২৭

তিন. জামায়াতে নামাজের তাকিদ ২৭

চার. নফল ইবাদতে উৎসাহ ২৮

পাঁচ. যিকিরের প্রতি উদ্‌বুদ্ধকরণ ৩২

ছয়. মুহাসাবা ৩৩

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায় : পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বজনীনতা ৩৯

জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা ৪০

ইসলামের ব্যাপকতার বিষয়ে অজ্ঞতা সৃষ্টির কারণ ৪৫

এক. পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞানচর্চার অভাব ৪৫

দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশনের প্রভাব ৪৫

ইখওয়ানের বিকল্প শিক্ষানীতি ৪৬

উন্নত চরিত্র গঠন ৪৮

এক. সবর ৫৪

দুই. অবিচলতা ৫৫

তিন. আশাবাদী হওয়া ৫৭

বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল ৬১

ঐতিহাসিক দলিল ৬১

নেতৃত্বের উত্থান-পতন সূত্রের দলিল ৬১

চার. ব্যয়ের মানসিকতা ৬২

শারীরিক সক্ষমতা অর্জন ৬৩

ইখওয়ানের শরীরচর্চার লক্ষ্য ৬৩

সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহ ৬৩

দৈহিক শক্তি ও কর্মতৎপরতা ৬৩

কষ্টসহিষ্ণুতা ৬৪

জিহাদের তারবিয়াত ৬৫

সমাজকল্যাণ ৭৯

রাজনীতি ৮২

ইখওয়ানের রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি ৮৫

এক. মুসলিম ভূখণ্ডসমূহ স্বাধীন করা ৮৫

www.bjilibrary.com

দুই. ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা ৯০
তিন. ইসলামের জন্য ঐক্য ৯৮

তৃতীয় অধ্যায় : **ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনমূলক কর্মতৎপরতা** ১০৫

আত্মগঠন ১০৯
আদর্শ পরিবার গঠন ১০৯
ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ ১১০
দেশের স্বাধীনতার হেফাজত ১১০
ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ১১০
উম্মাহর ঐক্য সাধন ১১০
বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব তৈরি ১১১

চতুর্থ অধ্যায় : **ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা** ১২১

সমাজদর্শনে ভারসাম্য ১৩১

দেশপ্রেম ও জাতীয়তার বিষয়ে ভারসাম্য ১৩৬
দেশের প্রতি ভালোবাসা মানবপ্রকৃতির অংশ ১৩৬
স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদ ১৩৭
ঐক্যের জন্য জাতীয়তা ১৩৭
বিজয়ের জন্য জাতীয়তা ১৩৮
দলীয়করণের জন্য জাতীয়তাবাদ ১৩৮
আমাদের জাতীয়তাবাদের সীমারেখা ১৩৯
আমাদের জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য ১৩৯

দাওয়াতি কাজে মানুষের শ্রেণিকরণে ভারসাম্য ১৪০

www.bjilibrary.com

পঞ্চম অধ্যায় : ভ্রাতৃত্ব ও একতা ১৪২

আমাদের দাওয়াতের অন্যতম ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব ১৪২

ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর বড়ো নিয়ামত ১৪৫

উপসংহার ১৪৯

www.bjilibrary.com

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

"তুমি দেখতে পাও শুষ্ক ও নির্জীব ভূমি। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার ওপর বারি বর্ষণ করেছেন, ফলে তা আন্দোলিত ও স্ফীত হয়েছে। মৃতপ্রায় হওয়ার পরও ফিরে পেয়েছে পুনরায় সজীবতা এবং উৎপন্ন করেছে সকল প্রকার নয়নাভিরাম উদ্ভিদ।"

যুগের প্রবাহে সময়কালটি হিজরি চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের আত্মপ্রকাশের প্রাক্কালে মুসলিম উম্মাহ যাপন করছিল এক ক্রান্তিকাল। তখন ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছিল নিভু নিভু করে জ্বলা ক্ষয়িষ্ণু খিলাফতব্যবস্থাও, যা ছিল ইসলামি বিশ্বাসের ভিত্তিতে একই পতাকাতলে সমবেত হওয়ার সর্বশেষ অবলম্বন। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি কুচক্রি ঔপনিবেশিক শক্তির থাবার আঘাতে মুসলিম সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। এমনকি মাত্র কয়েক মিলিয়ন অধিবাসীর দেশ হল্যান্ড প্রায় একশত মিলিয়ন অধিবাসীর জনপদ ইন্দোনেশিয়াকে শাসন করতে শুরু করে।

মুসলিম দেশসমূহে ইসলামি শাসনকে অকার্যকর ও কুরআনের বিধানকে বর্জনের কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে সকল আয়োজন সম্পন্ন করে ঔপনিবেশিকরা। মুসলিমদের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের ওপর প্রভাব বিস্তার করে তারা। ফলে সাধারণ মুসলিমদের জীবনে, বিশেষত পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত তথাকথিত সুশীলসমাজের জীবনাচারে মানবরচিত সংবিধান ও পশ্চিমাদের অন্ধ অনুসরণ হয়ে ওঠে প্রবল। এতে এমন এক প্রজন্ম গড়ে ওঠে– যারা নামে মুসলিম হলেও চিন্তাচেতনায় ছিল ইউরোপিয়ান। অধঃপতন, পশ্চাৎপদতাসহ হাজারো সমস্যায় জর্জরিত মুসলিম সমাজে উপনিবেশবাদের সমস্যা যুক্ত হওয়ায় সমাজের কদর্যতা বহুগুণে বেড়ে যায়। ব্যাধি মহামারির রূপ ধারণ করে।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছা হলো, তিনি মানুষের মধ্যে পবিত্র কুরআনকে সংরক্ষণ করবেন। ইসলামের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে তাকে অন্য সকল ধর্মমতের ওপর বিজয়ী করবেন। এ দ্বীনের জন্য তরুণদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করবেন এবং অধঃপতিত ও মৃতপ্রায় উম্মাহর দেহে নতুন করে জীবন ও প্রাণের সঞ্চার করবেন। তাই যেন এই তীব্র খরার মধ্যেই সবুজের স্বপ্ন নিয়ে সূচনা হয় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াত। এ মহতী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ইমাম হাসান আল বান্না। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পথচলা ইতোমধ্যে অতিক্রম করেছে সুবর্ণজয়ন্তী। অর্ধশতাব্দীর পথযাত্রায় ইখওয়ানুল মুসলিমিন মুসলিম বিশ্বের ভেতরে-বাইরে সকল স্থানে এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে বহু অবদান ও সফলতার স্বাক্ষর রেখেছে।

এ বইয়ে আমরা মিশর, আরব ও সামগ্রিকভাবে মুসলিমদের জীবনে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবদান ও তার ইতিহাস আলোচনা করব না। কেননা, কেবল একক প্রচেষ্টায় ব্যক্তিগত শক্তি-সামর্থ্যে এ অনন্য কীর্তিগাথাকে গ্রন্থাবদ্ধ করা দুরূহ ব্যাপার; বরং তা সাংগঠনিক উদ্যোগে ও সামষ্টিকভাবে করাটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ইখওয়ান এখন পর্যন্ত এ ইতিহাস রচনায় অনেকটা শিথিলতাই দেখিয়েছে। তবে প্রত্যেক সরকারের শাসনামলে ইখওয়ানের ওপর যে উপর্যুপরি আঘাত ও বিপর্যয় নেমে এসেছে, সেগুলোকে এ শিথিলতার কারণ হিসেবে পেশ করলে তা পুরোপুরি অন্যায্য বলা যাবে না।[১]

এ বইয়ে আমরা ইখওয়ানের এই মহান আন্দোলনের কেবল একটি দিক নিয়েই আলোচনা করব। আর তা হচ্ছে তালিম (শিক্ষা) ও তারবিয়াতের (প্রশিক্ষণের) দিক। অর্থাৎ, ইসলামের নির্দেশনার আলোকে ইখওয়ানুল মুসলিমিন যেভাবে তালিম-তারবিয়াতের লক্ষ্য, প্রয়োজনীয়তা ও পদ্ধতি অনুধাবন করেছে এবং বাস্তবায়ন করেছে, সে বিষয়ে আমরা একটি চিত্র আঁকার চেষ্টা করব এই বইয়ের চিত্রপটে।

---

১. এই আক্ষেপের প্রায় বিশ বছর পর ১৯৯৮ সালে এই বিষয়ে উসতায ইউসুফ আল কারযাভীর একক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। الإخوان المسلمون سبعون عاماً في الدعوة والتربية والجهاد শিরোনামের আলোচিত বইটির অনুবাদ শীঘ্রই প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। *'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিহাস : দাওয়াত, তারবিয়াত ও সংগ্রামের সত্তর বছর'* শিরোনামে প্রকাশিত এ বইটি যৌথভাবে অনুবাদ করেছেন মুহাম্মাদ শাহাদাত হোসাইন ও ফারুক আযম। –সম্পাদক

www.bjilibrary.com

অবশ্য আমরা এখানে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়াস পাব না; বরং এখানে শুধু প্রধান প্রধান দিকগুলো তুলে ধরব। শিক্ষাসম্পর্কিত বিষয়ে ইখওয়ানের চিন্তাচেতনা, তারবিয়াতনীতি এবং জাতিগঠনে তাদের কর্মকৌশলের বিষয়টিই এই আলোচনা স্পষ্ট করবে।

সচেতন পাঠকের কাছে এ বিষয়টি অস্পষ্ট নয় যে, ইখওয়ানের আন্দোলন তার সূচনাকালেই ইসলামি শিক্ষার একটি আদর্শ রূপ ধারণ করেছিল। আর তাতে যোগ হয়েছিল তারবিয়াতের সফল ধারা। ফলে ইখওয়ান একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। ইখওয়ানের গুরুত্বপূর্ণ অবদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো, তালিম-তারবিয়াতের মাধ্যমে এমন এক নবপ্রজন্ম গড়ে তোলা– যারা ইসলামকে যথার্থরূপে অনুধাবন করে, ইসলামের প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ করে, যারা ইসলামের কালিমাকে সমুন্নত করতে চায়, ইসলামের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং যারা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে নিজ পরিবার ও সমাজের মধ্যে কাজ করে।

নবপ্রজন্ম গঠনে ইখওয়ানের সফলতার কারণ

তালিম-তারবিয়াতের প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ

সমাজ বিনির্মাণ, ব্যক্তিত্ব গঠন এবং লক্ষ্য বাস্তবায়নে তালিম ও তারবিয়াতই হচ্ছে প্রধানতম উপকরণ– এই বিষয়ে অবিচল বিশ্বাসই এই সফলতার প্রথম কারণ। শহিদ ইমাম হাসান আল বান্না ভালো করেই জানতেন, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের এ পথ অনেক দীর্ঘ। এর গন্তব্য দিগন্তের সুদূর সীমানায়। এ পথে প্রতিবন্ধকতাও প্রচুর। এর দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রতিকূলতার কারণে খুব কম মানুষই এর ওপর ধৈর্যধারণ করতে পারে। আর এই স্বল্পসংখ্যকদের তালিকায় কেবল তারাই স্থান পায়, যারা দৃঢ় সংকল্পের অধিকারী। ইমাম বান্না এ কথাও বিশ্বাস করতেন, গড়ার কাজে এটিই একমাত্র পথ– যার কোনো বিকল্প নেই। এটিই সেই পথ, যে পথের সূচনা করেছেন স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সা.। এর মাধ্যমে তিনি সৃষ্টি করেছেন এমন এক আল্লাহপ্রেমী অতুলনীয় আদর্শ জাতি, যারা তাদের পরবর্তী প্রজন্মকে যথার্থরূপে গড়ে তোলা এবং সত্য ও কল্যাণের পথে পরিচালনার গুরুদায়িত্ব যথাযথভাবে আঞ্জাম দিয়েছে।

সুস্পষ্ট ও সুনির্ধারিত লক্ষ্য

এই তালিম-তারবিয়াতের নীতি ও বৈশিষ্ট্য ছিল এমন– যার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সুনির্ধারিত, পরিকল্পনাবলি সুস্পষ্ট ও উৎসগুলো সুবিদিত। এই তালিম-

www.bjilibrary.com

তারবিয়াতের কর্মসূচিগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং কর্মকৌশল ছিল বিচিত্র। আর তা এমন দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত– যা সহজবোধ্য। সর্বোপরি এর সকল কিছুই কেবল ইসলামের জ্ঞানভান্ডার থেকেই সংগৃহীত।

ইসলামি জীবন গঠনে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সৃষ্ট ইতিবাচক সম্মিলিত পরিবেশ ছিল অনন্য। এই পরিবেশ এর প্রত্যেক সদস্যকে আদর্শ ইসলামি জীবনযাপনে অনুপ্রাণিত করে এবং সক্রিয়ভাবে কাজ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। কেননা, একজন ব্যক্তি নিজেকে তুচ্ছ ও দুর্বল মনে করলেও তার ভাইদের সঙ্গে মিলে নিজেকে সক্রিয় ও সবল মনে করে। কারণ, সে একাকী দুর্বল হলেও সমষ্টির সঙ্গে মিলে সে অনেক সবল। এই সংঘবদ্ধতা কল্যাণ ও নেক কাজে শক্তি জোগায় এবং অকল্যাণ ও পাপ কাজ থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই হাদিস শরিফে এসেছে–

يَدُ اللهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ

"সামষ্টিকতায় রয়েছে আল্লাহর সাহায্য।" তিরমিযি : ২১৬৩

فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاصِيَةَ.

"নেকড়ে দলছুট বকরিকেই আক্রমণ করে।" হাকিম : ৭৬৫

আল্লাহভীরু নেতৃত্ব

নবপ্রজন্ম তৈরিতে ইখওয়ানের সাফল্যের অন্যতম নিয়ামক ছিল, স্বভাবজাত যোগ্যতা ও দক্ষতাসম্পন্ন মহান নেতা ও মুরব্বি। আল্লাহ তায়ালা তাকে অসামান্য ঈমানি শক্তি দান করেছেন। তিনি ছিলেন এমন নেতা, যার সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তরে তিনি জায়গা করে নিতেন; এমনকি তার অন্তর থেকে আশপাশের লোকদের অন্তরেও এই গুণ প্লাবিত হতো। তিনি ছিলেন পিতার মতো, যার কাছ থেকে অন্যরা নিজেদের অন্তরে অনুপ্রেরণা লাভ করে। কেননা, অনেক কথা এমন আছে, যা না চাইলেও আপনার হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবেশ করে তাতে জায়গা করে নেয়। আবার কিছু কথা এমনও আছে, যা জিহ্বা থেকে নির্গত হয়ে শ্রবণেন্দ্রিয়কে অতিক্রম করতে পারে না। মূলত জীবিত অন্তরের অধিকারী ব্যক্তিই তার শ্রোতা ও দর্শনার্থীদের অন্তরে প্রাণসঞ্চার করেন। আর মৃত অন্তরের অধিকারী অন্যের অন্তরকে জীবিত করতে পারে না। কেননা, ঝুলিশূন্য ব্যক্তি অন্যকে কিছুই দিতে পারে না। ভাড়াটে বিলাপকারিণী আর সন্তানহারা জননী কি কখনও এক হতে পারে?

www.bjilibrary.com

মুখলিস ও আমানতদার দক্ষ প্রশিক্ষক

এই মহান প্রজন্ম তৈরিতে প্রধান ভূমিকা রেখেছেন দক্ষ, নিষ্ঠাবান ও আমানতদার একদল প্রশিক্ষক। সেই প্রশিক্ষকগণ তাদের দায়িত্বশীলের কর্মপদ্ধতিতে আস্থা রেখে তারই দেখানো পথের অনুসরণ করেছেন এবং শিক্ষার্থীদের মাঝে ইতিবাচক প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছেন। এরপর এ সকল শিক্ষার্থী তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষকে পরিণত হয়েছেন এবং এ ধারা এখনও অব্যাহত আছে।

যুগোপযুগী ও বিচিত্র উপকরণ

তালিম-তারবিয়াতের যুগোপযুগী ও বিচিত্র সব কর্মসূচি ও উপকরণ হাজির করে ইখওয়ানুল মুসলিমিন। এসব উপকরণের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকেন্দ্রিক, আর কিছু সামষ্টিক। কিছু তাত্ত্বিক, কিছু প্রায়োগিক। কিছু বুদ্ধিবৃত্তিক, আবার কিছু অনুভূতিমূলক। কিছু ইতিবাচক, আর কিছু নেতিবাচক। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে– দারস, খুতবা, বক্তৃতা, সভা-সমাবেশ, ব্যক্তিগত যোগাযোগ ইত্যাদি। এসব উপকরণের মধ্যে আরও আছে– বিশেষ প্রতীক, নির্দিষ্ট স্লোগান, এমনসব কবিতা ও গান– যার কথা, সুর ও তরঙ্গ অন্তরে রেখাপাত করে। আরও আছে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত ঘরোয়া বৈঠক– যেখানে কুরআন পাঠ, সংস্কৃতি চর্চা, ইবাদত ও ভ্রাতৃত্বের অনুশীলন করা হতো। এ জাতীয় প্রতিটি বৈঠককে 'উসরা' (أسرة) বা পরিবার বলে নামকরণ করা হয়। এর মাধ্যমে মূলত সেই সম্প্রীতি ও ভালোবাসার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়– যা একই পরিবারের সন্তানদের মধ্যে বিরাজ করে।

এ ছাড়াও সাংগঠনিকভাবে আরও বিভিন্ন প্রোগ্রামের আয়োজন করা হতো– যার সময় ছিল নিশুতি রাতে। এসব প্রোগ্রামের কর্মসূচি এমনভাবে সাজানো হতো, যাতে সংস্কৃতি চর্চার ফলে বুদ্ধির বিকাশ ঘটে, ইবাদতের মাধ্যমে অন্তর সঞ্জীবিত হয় এবং শরীরচর্চার মাধ্যমে দেহ সতেজ হয়। এ বিষয়টিকে 'আল-কাতিবা' (الكتيبة) বা ব্যাটেলিয়ান নামকরণ করা হয়। উদ্দেশ্য হলো, জিহাদের জন্য অনুপ্রাণিত করা। এরকম আরও বহু উপকরণ ও মাধ্যম ইখওয়ানের তালিম-তারবিয়াতের কর্মসূচিতে চর্চা করা হয়েছে– যার লক্ষ্য হলো পূর্ণাঙ্গ মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠন।

www.bjilibrary.com

মূলত প্রতিটি শিক্ষাব্যবস্থার মূল্য নির্ধারিত হয় তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দ্বারা। এমনকি প্রাণীদের বেলায়ও। যেমন– দুধের জন্য পোষা গাভি এবং গোশতের জন্য পোষা গরু ভিন্নতর। আবার, গোশতের জন্য পোষা গরু চাষাবাদের উদ্দেশ্যে পোষা গরু থেকে ভিন্ন হয়।

শিক্ষার সাথে মানুষের সম্পর্কও অনুরূপ। যেমন– অস্তিত্ববাদীর শিক্ষা সাম্যবাদীর শিক্ষা থেকে ভিন্ন। আবার এই দুই শ্রেণির শিক্ষা বুর্জোয়া বা পুঁজিবাদীদের শিক্ষা থেকে ভিন্ন। অনুরূপভাবে এদের সকলের শিক্ষা, মুসলিম ব্যক্তির শিক্ষা থেকে ভিন্ন। আবার ঈমানদার মুসলিমের শিক্ষা, প্রত্যক্ষবাদী নামসর্বস্ব মুসলিমের শিক্ষা থেকে ভিন্ন। এমনিভাবে যে মুসলিম এমন সমাজে বেড়ে উঠেছে– যেখানে কুরআনের শাসন ও ইসলামি শিক্ষার প্রাধান্য রয়েছে, তার শিক্ষা ওই মুসলিমের শিক্ষা থেকে ভিন্ন হবে, যে বেড়ে উঠেছে এমন সমাজে– যেখানে জাহিলিয়াত ও ইসলামের সংঘাত চলমান এবং কুফর ও ঈমানের লড়াই বিরাজমান।

কিছু মুসলিম কেবল নামাজ, রোজা ও দুআ করাকেই যথেষ্ট মনে করে। যখন তার সামনে ইসলাম ও মুসলিমদের করুণ অবস্থা আলোচনা করা হয়, তখন সে শুধু 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' ও 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' বলেই ক্ষান্ত হয়। নিশ্চয় এমন ব্যক্তির শিক্ষা ওই মুসলিমের শিক্ষা থেকে ভিন্ন হবে, যার অন্তর ইসলামের সম্মান রক্ষায় তেমনি উদ্‌বেলিত হয়, যেমন আগুনের ওপর ফুটন্ত পানি টগবগ করতে থাকে। তার অন্তর মুসলিমদের কষ্টে তেমনিভাবে বিগলিত হয়, যেমন পানিতে পড়ে লবণ গলে যায়। অতঃপর তার সেই দুঃখ-ব্যথা তাকে তাড়িত করে এমন এক প্রতিরোধকারী শক্তিতে পরিণত করে– যা পরিবর্তন ও বিপ্লবের পথ দেখায়।

এই হলো সেই প্রতীক্ষিত মুসলিম, যে কখনও উদ্ভূত পরিস্থিতির সামনে আত্মসমর্পণ করে না; বরং সে আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তনের জন্য নিরবধি কাজ করে যায়, সে তাকদির ও আল্লাহর ফয়সালাকে অজুহাত বানিয়ে হাল ছেড়ে দেয় না। বরং সে বিশ্বাস করে, আল্লাহর ফয়সালাই চূড়ান্ত এবং তা এমন অপ্রতিরোধ্য শক্তি– যার গতিকে কোনো কিছুই রোধ করতে পারে না। এ-ই সেই মুসলিম, যে তার ওপর অর্পিত রিসালাতের দায়িত্ব পালন, জাতি গঠন ও সভ্যতা বিনির্মাণের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখে।

www.bjilibrary.com

ইমামুদ দাওয়াহ হাসান আল বান্না বলেন–

> "রিসালাতের পয়গাম এতই বিস্তৃত যে, তার দৈর্ঘ্য সকল যুগকে শামিল করে, তার প্রস্থ সকল জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করে এবং তার গভীরতা দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয়কে বেষ্টন করে নেয়।"[২]

মুসলিমরা হচ্ছে সেই উম্মাহ, মহান আল্লাহ যাদের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন, তাদের প্রতি সর্বোত্তম কিতাব অবতীর্ণ করে এবং তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল প্রেরণ করে। তাদের করেছেন শ্রেষ্ঠ উম্মত এবং সকল কাজে মধ্যমপন্থি। তাদের দিয়েছেন অন্য সকল উম্মতের শিক্ষক ও সাক্ষীর মর্যাদা।

এ উম্মতকে মহান রব আরও দিয়েছেন বিশ্বমানবতার এমন এক সভ্যতা– যা উত্তম চরিত্রের ধারক এবং প্রভুর কাছে প্রিয়। এ সভ্যতা সমন্বয় করেছে ইলম ও ঈমানকে; একীভূত করেছে জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতাকে; ভারসাম্য রক্ষা করেছে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যে। আর এ সভ্যতা মানুষের জন্য সংরক্ষণ করেছে সকল মানবীয় বৈশিষ্ট্য ও সম্মান।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রথম মিশন ছিল– ইসলামি তালিম ও তারবিয়াত (শিক্ষা ও দীক্ষা)-এর ব্যাপক প্রচলন। কেননা, এটিই হচ্ছে পরিবর্তনের ভিত্তিমূল এবং সংস্কার ও কল্যাণের কেন্দ্রবিন্দু। এটি ছাড়া ইসলামি জীবনবোধের সূচনা অথবা ইসলামি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কিংবা ইসলামি আইন বাস্তবায়নের চিন্তা করা যায় না।

ইখওয়ানের অনুধাবন ও প্রয়োগনীতি অনুযায়ী ইসলামি শিক্ষার বেশকিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হলো– রাব্বানিয়্যাত বা আল্লাহমুখী জীবন, পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বজনীনতা, ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনমূলক চিন্তা, ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা, ভ্রাতৃত্ব ও একতা, স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা ইত্যাদি।

এ বইয়ে আমরা এগুলোর প্রত্যেকটি সম্পর্কে যথাসম্ভব আলোচনার প্রয়াস পাব, ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ সহায় হোন।

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

***

---

২. এ কথাগুলো শহিদ হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দৈনিক পত্রিকায় 'হেরার ওহি থেকে' (من وحي حراء) শিরোনামের কলামে আলোচনা করেন।

www.bjilibrary.com

প্রথম অধ্যায়

রাব্বানিয়্যাত

ইসলামি শিক্ষার প্রধানতম দিক হলো– রাব্বানিয়্যাত বা আল্লাহপরস্তি বা ঈমানের অনুশীলন। ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই দিকটির গুরুত্ব যথাযথভাবে অনুধাবন করেছে এবং কাজের মাধ্যমে এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছে। কেননা, রাব্বানিয়্যাত হচ্ছে ইসলামি শিক্ষার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দিক এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল ও গভীর প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়। আর তা এ কারণে যে, ইসলামি শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হলো মুমিনের ব্যক্তিত্ব গঠন।

ইসলামে ঈমান বলতে শুধু মৌখিক বক্তব্য বা দাবিকে বোঝায় না; বরং ঈমান হচ্ছে এমন বাস্তবতা– যার রোশনি বিবেক-বুদ্ধি পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে তাকে তৃপ্ত করে, মানুষের প্রবৃত্তি ও আবেগকে সংযত করে এবং ইচ্ছাশক্তিকে গতিশীল করে। যেমন, এক বর্ণনায় এসেছে–

مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبِ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلُ

> "ঈমান বলা হয় ওই বিশ্বাসকে, যা অন্তরে বদ্ধমূল হয় এবং কাজের মাধ্যমে তা প্রতিফলিত হয়।"

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ করেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَ

أَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

> "নিশ্চয় তারাই মুমিন, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান এনেছে, অতঃপর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব করেনি এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে। আসলে এরকম লোকেরাই সত্যনিষ্ঠ।" সূরা হুজুরাত : ১৫

www.bjilibrary.com

ইসলামে ঈমান শুধু যৌক্তিক পরিচয় নয়, যেমনটি যুক্তিবাদী ও দার্শনিকরা মনে করে থাকে। সুফি-সাধকদের মতো শুধু আধ্যাত্মিকতাও নয়। দুনিয়াবিরাগী ও তপস্যাকারীদের মতো নিছক উপাসনার কোনো পথও নয়। বরং এ সবের সমষ্টিই হচ্ছে ইসলামের ঈমান। ইসলাম সব ধরনের বক্রতা, বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি থেকে মুক্ত পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা– যার সংস্পর্শে পৃথিবীতে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। আর এর মাধ্যমে জীবন হবে কল্যাণমুখর এবং মানুষ ও মানবসমাজ পরিচালিত হবে সঠিক পথে।

ধর্মতত্ত্ববিদ, সুফি ও ফকিহগণ যথার্থ ঈমানের উপকরণসমূহের মাঝে যে পার্থক্য করেছেন, ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের শিক্ষাব্যবস্থায় সেই পার্থক্য ঘুচিয়ে সেগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছে। তা ছাড়া শেষ যুগের মুসলিমরা ঈমানের যে সঠিক অর্থ ও মর্মকে সেকেলে মনে করেছে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন তা নতুন রূপে উপস্থাপন করেছে। ফলে তারা সঠিক উৎসে ফিরে গিয়েছে এবং সেখান থেকে ঈমানের আসল রূপ চিনতে পেরেছে।

মহিমান্বিত কিতাব ও পবিত্র সুন্নাহ নির্দেশিত ঈমানের শাখা ষাট বা সত্তরের অধিক। ইমাম বায়হাকি রহ. ঈমানের এ শাখা-প্রশাখা প্রসঙ্গেই *শুআবুল ঈমান* কিতাবটি রচনা করেন। সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারী আমাদের পূর্বসূরিদের ঈমানই আমাদের জন্য অনুসরণীয়। তাদের ঈমানে আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকৃতি ও কাজের মাধ্যমে প্রতিফলন ইত্যাদি সবকিছুর সন্নিবেশ ঘটেছিল। তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছিল ঈমানের নিদর্শন। মসজিদে, বাড়িতে-সমাজে, নির্জনে-লোকালয়ে, রাতে-দিনে, জাগতিক ব্যস্ততায় কিংবা আখিরাতের মগ্নতায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের জীবন ছিল ঈমানের রঙে বর্ণিল। ইখওয়ানের তালিম-তারবিয়াতে ঈমানের এ বিস্তৃতি ও গভীরতাকে যথার্থভাবে ধারণ করা হয় এবং এটি ইখওয়ানের শিক্ষাধারার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। ইখওয়ানের শিক্ষা ও অনুশীলনে ঈমানের আরও কিছু বৈশিষ্ট্য হলো– তার সঞ্জীবনী শক্তি, প্রতিরোধকারী ক্ষমতা ও গতিশীলতা। কেননা, এটি হচ্ছে প্রজ্বলিত রশ্মি, প্রবল বেগে প্রবাহিত স্রোত, অন্ধকার দূরকারী আলো এবং এমন আগুন– যা সকল অন্যায়কে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ভস্মীভূত করে দেয়।

তাকওয়া লালনের ভিত্তি হলো এমন জীবিত অন্তর– যা সর্বদা আল্লাহর স্মরণে নিমগ্ন, আল্লাহর সাক্ষাতের প্রত্যাশী, আল্লাহর বিচারে বিশ্বাসী, আল্লাহর রহমতের আশাবাদী এবং আল্লাহর শাস্তিকে ভয়কারী। মানুষের প্রকৃত রূপ তার

www.bjilibrary.com

বাহ্যিক আকৃতি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, দেহকোষ, হাড় ও মাংসপেশী নয়; বরং তার প্রকৃত রূপ হচ্ছে– এ আকৃতিতে বসবাসকারী আল্লাহর সৃষ্ট একটি অদৃশ্য বস্তু, যা তাকে আন্দোলিত করে, ভালো কাজের আদেশ করে এবং অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে। এটি সেই মাংসপিণ্ড– যা বিশুদ্ধ হলে সারা শরীর বিশুদ্ধ হয় আর তা নষ্ট হয়ে গেলে সারা শরীর বিনষ্ট হয়। এটাকেই বলে অন্তর। অন্তর, রুহ বা হৃদয়– যে নামেই নামকরণ হোক, এটি মানুষের দেহাভ্যন্তরে বিরাজমান এক প্রহরী– যা মানুষকে গভীর জীবনবোধ ও সৃষ্টির রহস্যের সাথে যুক্ত করে এবং তাকে দুনিয়ার জগৎ থেকে আসমানের জগতে নিয়ে যায়। সৃষ্টি থেকে স্রষ্টার পানে এবং নশ্বর পৃথিবী থেকে অবিনশ্বর জগতে পৌঁছে দেয়।

জীবিত অন্তর আল্লাহ তায়ালার সুদৃষ্টির জায়গা। তাঁর নূর ও জ্যোতির অবতরণস্থল। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

"নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের বাহ্যিক আকৃতি ও সম্পদ দেখেন না; তিনি দেখেন তোমাদের অন্তর ও আমল।" মুসলিম : ২৫৬৪

অন্তরই একমাত্র অবলম্বন– কিয়ামতের দিন বান্দা যেটিকে আপন রবের সামনে নাজাতের ওসিলা হিসেবে পেশ করবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ. إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ.

"যেদিন ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততি কোনো কাজে আসবে না। সেদিন কেবল সেই ব্যক্তিই উপকৃত হবে, যে আল্লাহর কাছে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে উপস্থিত হবে।" সূরা শুআরা : ৮৮-৮৯

অন্তর যদি ঈমান দ্বারা সমৃদ্ধ না হয় এবং বিশ্বাসের নিগঢ়ে আলোকোজ্জ্বল না হয়, তাহলে সেই মানুষটি মৃত; যদিও আদমশুমারি তাকে জীবিতদের মধ্যে গণ্য করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেন–

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٢٢﴾

"আর সে মৃত ছিল, অতঃপর আমি তাকে জীবিত করেছি। তাকে এমন আলো দান করেছি, যা নিয়ে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে। সে কি ওই ব্যক্তির সমতুল্য হতে পারে, যে অন্ধকারে থেকে

www.bjilibrary.com

গেছে এবং সেখান থেকে বের হতে পারছে না? এভাবেই কাফিরদের দৃষ্টিতে তাদের কাজকর্মকে সুশোভিত করে দেওয়া হয়েছে।" সূরা আনআম : ১২২

ইখওয়ানুল মুসলিমিন এ জন্যই অন্তরকে জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছে, যেন তা অবেলায় মরে না যায়। ইখওয়ান একই সাথে মনকে সজীব ও প্রাণোচ্ছল করার প্রতি মনোনিবেশ করেছে, যেন তা বিরান হয়ে না যায়। ইখওয়ানুল মুসলিমিন অন্তরের কোমলতার প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে, যেন তা কঠোর হয়ে না যায়। কারণ, অন্তরের কঠোরতা ও অশ্রুর জমাটবদ্ধতা একধরনের শাস্তি। আল্লাহ তায়ালার কাছে এর অনিষ্টতা থেকে মুক্তি চাইতে হয়। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলকে নিন্দা করে বলেছেন–

فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً... ﴿١٣﴾

"তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমি তাদের ওপর অভিসম্পাত করেছি, তাদের অন্তরকে কঠিন করে দিয়েছি।" সূরা মায়িদা : ১৩

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা তাদের সম্বোধন করে বলেন–

ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُم مِّن بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ... ﴿٧٤﴾

"অতঃপর এ ঘটনার পরে তোমাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। এমনকি তা হয়ে গেছে পাথরের মতো।" সূরা বাকারা : ৭৪

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সতর্ক করে বলেন–

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾

"যারা ঈমান এনেছে, তাদের জন্য কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে, তার কারণে হৃদয় বিগলিত হওয়ার সময় আসেনি? তারা যেন ওই সকল লোকের মতো না হয়, যাদের ইতঃপূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল। এরপর তাদের ওপর সুদীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হয়েছে, একসময় তাদের অন্তর কঠিন হয়ে গেছে। তাদের অধিকাংশই পাপাচারী।" সূরা হাদিদ : ১৬

www.bjilibrary.com

নবি কারিম সা. আল্লাহ তায়ালার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন এমন ইলম থেকে, যা কোনো উপকারে আসে না এবং এমন অন্তর থেকে, যা বিগলিত হয় না। উসতায হাসান আল বান্নার বিভিন্ন পত্র, প্রবন্ধ, কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দেওয়া সাধারণ বক্তব্য এবং বিভিন্ন সাক্ষাৎকার, সেনাবাহিনী ও জাতির উদ্দেশে দেওয়া বিশেষ ভাষণগুলো মানবহৃদয়ে কড়া নাড়ে। ফলে হৃদয়ে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর রহমতের আশা ও শাস্তির ভয় জাগ্রত হয়, অন্তর আল্লাহ-অভিমুখী হয়। আল্লাহ তায়ালার ওপর ভরসা ও তাঁর নিকট যে বিশাল নিয়ামতরাজি রয়েছে, তার প্রতি বিশ্বাস সুদৃঢ় হয়। আল্লাহ তায়ালার প্রতি ভালোবাসা এবং তাঁর ফয়সালার ওপর অন্তর পরিতৃপ্ত হয়। আল্লাহ তায়ালার নৈকট্যের অনুভব এবং তাঁর স্মরণে হৃদয় প্রশান্ত হয়। যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেছেন–

...أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"জেনে রাখো, আল্লাহর যিকির দ্বারা অন্তরসমূহ প্রশান্তি লাভ করে।"
সূরা রাদ : ২৮

এর প্রভাবে মুমিনের অন্তর কঠিন কাজকেও সহজ মনে করে। তিক্ততা তার কাছে সুস্বাদু হয়ে যায়। শাস্তিকে সুমিষ্ট লাগে। সে দুঃখ-যাতনা ও কষ্টকে সহজ মনে করে। এমনকি যতক্ষণ তারা আল্লাহর পথে আল্লাহর জন্য জিহাদ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সকল কষ্ট-যাতনাকে সে উপভোগ করে, যেমনিভাবে প্রেমিক তার ভ্রমণকষ্টে বিশেষ তৃপ্তি অনুভব করে, সে ক্ষুৎ-পিপাসার কথা ভুলে যায়, যখন তার লক্ষ্য হয় তার প্রিয়তমার সাক্ষাৎ লাভ।

মানুষের দেহের মতো অন্তরের জন্যও তিনটি জিনিসের প্রয়োজন হয় :

১. অন্তরের নিরাপত্তা
২. অন্তরের বেঁচে থাকার জন্য খোরাক
৩. অন্তরের সুস্থতার জন্য চিকিৎসা।

অন্তরের নিরাপত্তা ও চিকিৎসা

অন্তরকে সর্বপ্রথম যে জিনিস থেকে নিরাপত্তা দেওয়া আবশ্যক তা হলো– দুনিয়ার আসক্তি বা মহব্বত। কেননা, এটি সকল পাপের মূল এবং সকল রোগের ভিত্তি। আর তার প্রতিরোধক ভ্যাকসিন হলো– আখিরাতের প্রতি

www.bjilibrary.com

বিশ্বাস ও উৎসাহ; আল্লাহ তায়ালার প্রতিদানের কথা স্মরণ করা; আমাদের কাছে যে ধনসম্পদ আছে, তার তুচ্ছতা এবং আল্লাহর নিকট বিশাল নিয়ামতরাজি রয়েছে তার মহত্ত্বের তুলনা করা; যদিও নশ্বর আর অবিনশ্বরের মাঝে কোনো তুলনা হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ... ﴿٩٦﴾

"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা কখনও শেষ হবে না।" সূরা নাহল : ৯৬

মুমিনের জন্য তার রবের এ সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য তুলনাটি পাঠ করাই যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَآءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ ﴿١٤﴾ قُلْ اَؤُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذٰلِكُمْ ؕ لِلَّذِيْنَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَاَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَّرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ ؕ وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِالْعِبَادِ ﴿١٥﴾

"মানুষের নিকট সুশোভিত করা হয়েছে নারী, সন্তানসন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্বরাজি, গবাদি পশু এবং খেতখামারের প্রতি আসক্তি। এসব হচ্ছে পার্থিব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। (তাদের) বলুন– আমি কি তোমাদেরকে এসবের চাইতেও উত্তম বিষয়ের সন্ধান দেবো? (আর তা হলো–) যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, তাদের রবের নিকট তাদের জন্যে রয়েছে জান্নাতসমূহ, যার তলদেশে প্রস্রবণ প্রবাহিত হবে। তারা সেখানে থাকবে অনন্তকাল। আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনীগণ এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা।" সূরা আলে ইমরান : ১৪-১৫

এখানে এসব বস্তুগত কামনার কারণ হিসেবে উদরপূর্তির চাহিদা ও যৌনবাসনা, সম্পদ ও সন্তানসন্ততির ভালোবাসাকে উল্লেখ করা হয়েছে। এর চেয়ে আরও ভয়ংকর হলো– অন্তরের কামনা ও কুপ্রবৃত্তি। কারণ, পৃথিবীতে কুপ্রবৃত্তিই হচ্ছে নিকৃষ্টতর উপাস্য।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ... ﴿٥٠﴾

"আল্লাহর পথনির্দেশ অগ্রাহ্য করে যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে, তার চেয়ে পথভ্রষ্ট আর কে আছে!" সূরা কাসাস : ৫০

সম্মানের আকাঙ্ক্ষা ও ক্ষমতার লোভ, সৃষ্টজীবের ওপর কর্তৃত্ব, সুনাম ও সুখ্যাতির চাহিদা, সাধারণ মানুষের থেকে বাহবা পাওয়ার চেষ্টা অথবা বিশেষ শ্রেণির তোষামোদ ইত্যাদি হলো ধ্বংসাত্মক ব্যাধি– যা অন্তরে পৌঁছে তাকে অন্ধ ও বধির করে দেয় অথবা তাতে হত্যাকাণ্ড কিংবা ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। ইমাম আবু হামিদ গাযালি রহ. তাঁর *ইহয়াউ উলুমিদ দ্বীন* গ্রন্থে এগুলোকে হাদিসে নববির আলোকে 'মুহলিকাত' তথা ধ্বংসাত্মক বলে নামকরণ করেছেন। সেই হাদিসটি হলো–

ثَلَاثٌ مُهْلِكَاتٌ شُحٌّ مُطَاعٌ وَهَوًى مُتَّبَعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ

"তিনটি বিষয় ধ্বংসাত্মক– এমন কৃপণতা, যার আনুগত্য করা হয়। এমন প্রবৃত্তি, যার অনুসরণ করা হয় এবং নিজেকে নিয়ে গর্ব করা।" শুআবুল ঈমান : ৭৩১

আফসোসের বিষয় হলো– ব্যক্তি ও সমাজ বিনষ্টকারী এ বিষয়গুলোর প্রতি অনেকে খেয়াল করে না। তাদের পূর্ণ মনোযোগ থাকে প্রকাশ্য ধ্বংসাত্মক অপরাধমূলক কাজ তথা– চুরি, মিথ্যাচার, মদ্যপান ইত্যাদির প্রতি। নিঃসন্দেহে এগুলো ধ্বংসাত্মক কাজ। তবে এসব প্রকাশ্য পাপাচারের ক্ষতি ও ভয়াবহতার তুলনায় লুক্কায়িত এই পাপগুলোর ধংসাত্মকতা অনেক বেশি। বস্তুত এসব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধ্বংসাত্মক কাজের প্রত্যেকটির পেছনে রয়েছে আত্মিক ব্যাধি। যে এসব জানে, সে তো এগুলোর প্রতি খুব সতর্ক ও যত্নবান। আর যে জানে না, সে একেবারেই উদাসীন।

এ কারণেই দাওয়াতি কাজ শুরুর প্রথমদিন থেকে গুরুত্বারোপ করা হয়– অন্তরকে দুনিয়ার আকর্ষণ থেকে মুক্ত করে, তাকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে একমাত্র আল্লাহর জন্য সঁপে দেওয়ার প্রতি। আর অন্তরকে দুনিয়ার ধনৈশ্বর্যের মহব্বত থেকে সংযত করা হয়, যেগুলো মহান আল্লাহর দরবারে কোনো কাজে আসবে না। এভাবে খোদাভীতিকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে রেখে সকল চিন্তা ও অনুভূতিকে আখিরাতমুখী করা হয়– যাতে নিজেদের সকল উপায়-উপকরণকে সে মহান লক্ষ্যে প্রস্তুত করা যায়।

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শিক্ষানীতিতে রাব্বানিয়্যাতের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিস্তৃত জায়গা জুড়ে আছে। কাজেই আমাদের দাওয়াতে রাব্বানিয়্যাতের দাওয়াতের অবস্থান সর্বাগ্রে। রাব্বানিয়্যাতের এ দাওয়াতের উদ্দেশ্য হচ্ছে– মানুষের হৃদয়কে আল্লাহ-অভিমুখী করা এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকে জীবনের পরম লক্ষ্য বানানো। যেমনটি কবি বলেছেন–

اذا صح منك الود فالكل هين *** وكل الذي فوق التراب تراب

সকল যাতনা সহজ, যদি ভালোবাসা হয় খাঁটি
পৃথিবীর 'পরে যত আয়োজন সবই যেন মাটি।

আল্লাহ তায়ালা বাহ্যিক আকৃতি দেখেন না; বরং তিনি দেখেন অন্তর। তিনি বাহ্যিক আমলের কোনো প্রতিদান দেন না; বরং বাহ্যিক আমলের পেছনে যে ইখলাস থাকে, তার প্রতিদান দেন। অতএব, আল্লাহ তায়ালা শুধু সেই আমলকেই কবুল করেন– যা একনিষ্ঠভাবে কেবল তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। কেননা, তিনি শিরক (অংশীদারত্ব) থেকে সবার্ধিক অমুখাপেক্ষী। তা ছাড়া রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) হলো প্রচ্ছন্ন শিরক। আর আল্লাহ তায়ালা শিরকযুক্ত আমল ও অন্তর কোনোটিই পছন্দ করেন না। শিরকযুক্ত আমল ও অন্তর কোনোটিই তাঁর দরবারে গৃহীত হয় না। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ رَبِّهٖ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَّلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖٓ اَحَدًا ﴿١١٠﴾

"অতএব, যে তার রবের সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরিক না করে।"
সূরা কাহফ : ১১০

এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতীক নির্ধারণ করা হয়েছে– আল্লাহু আকবার ওয়া লিল্লাহিল হামদ (আল্লাহ সর্বমহান এবং আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা)। ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের জনশক্তিদের সর্বপ্রথম যে স্লোগানটি শিখিয়েছে এবং এর মাধ্যমে তাদের মনমস্তিষ্কে জীবনের যে মহৎ লক্ষ্যকে বদ্ধমূল করেছে তা হলো– الله غايتنا "আল্লাহই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।"

রিসালাতুত-তাআলিম-এ শহিদ ইমাম হাসান আল বান্না বিশটি মূলনীতির (আল-উসূলুল ইশরিন) অধীনে বাইয়াতের প্রথম রুকন হিসেবে এনেছেন 'আল-ফাহম' তথা ইসলামকে সঠিকভাবে অনুধাবন করার কথা। অতঃপর

www.bjilibrary.com

তিনি যে বিষয়টিকে বাইয়াতের দ্বিতীয় রুকন হিসেবে স্থির করেছেন তা হলো, 'ইখলাস' বা একনিষ্ঠতা। তিনি ইখলাসের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন–

"একজন মুসলিম তার কথা, কাজ ও জিহাদ ইত্যাদি সবকিছু কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং তাঁর থেকে প্রতিদান লাভের জন্য করবে। কোনো প্রকার জাগতিক সুবিধা, যশ, খ্যাতি, উন্নতি ও অগ্রগতি তার লক্ষ্য হবে না। এর মাধ্যমে সে হয়ে উঠবে একজন বিশ্বাসের সৈনিক; স্বার্থ ও সুবিধার সৈনিক নয়।"

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦٢﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٦٣﴾

"আপনি বলুন– আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও মরণ জগৎসমূহের প্রতিপালক আল্লাহর জন্যই। তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি এর জন্যই আদিষ্ট হয়েছি এবং আমিই প্রথম সমর্পিত।"
সূরা আনআম : ১৬২-১৬৩

অন্তরের ব্যাধি এবং এর বিপদ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই জানেন যে, দাওয়াতি কাজে নিয়োজিত দাঈগণ সবচেয়ে বিপজ্জনক যে প্রতিবন্ধকতার শিকার হন তা হলো– সুখ্যাতি অর্জনের চিন্তা, নেতৃত্বের লোভ এবং প্রসিদ্ধি কামনা। এ জন্যই রাসূলে কারিম সা. সম্মান ও সম্পদের লোভ এবং প্রচ্ছন্ন শিরক তথা রিয়া ও অহংকার থেকে উম্মতকে সতর্ক করেছেন।

পবিত্র কুরআন ও হাদিসে ওই সকল লোকের উচ্চ প্রশংসা করা হয়েছে, যারা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করে এবং যারা কারও থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার আশা করে না। রাসূলুল্লাহ সা. ওই ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী ও নিভৃতচারী মুসলিমের প্রশংসা করেছেন, যে নিজের দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে পালন করে এবং জনারণ্য থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, ফলে মহৎ ব্যক্তি হিসেবে তার দিকে ইশারা করা হয় না। রাসূল সা. বলেছেন–

رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرَ ذُو طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ

"কিছু এমন লোকও আছে, যারা উশকোখুশকো চুলবিশিষ্ট, ধুলোমলিন, দুটি জীর্ণবস্ত্র পরিহিত এবং তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপও

www.bjilibrary.com

করা হয় না। (অথচ সে আল্লাহর নিকট এত প্রিয় যে) সে যদি আল্লাহর নামে কসম করে, তাহলে আল্লাহ তায়ালা তা পূর্ণ করে দেন।" তিরমিযি : ৩৮৫৪

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشْعَثَ رَأْسُهُ، مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، كَانَ فِي الحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ

"সৌভাগ্য ওই বান্দার জন্য, যে আল্লাহর রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে থাকে। তার মাথার চুল উশকোখুশকো এবং পা ধুলোমলিন হয়। যদি তাকে সেনাবাহিনীর সামনের ভাগে পাহারায় নিযুক্ত করা হয়, তাহলে সে সন্তুষ্টচিত্তে পাহারার কাজেই নিয়োজিত থাকে। আর যদি তাকে সেনাবাহিনীর পেছনের দিকের দায়িত্বে রাখা হয়, তাহলে সে পেছনেই থাকে।" বুখারি : ২৮৮৭

আল্লাহ তায়ালা 'সাইফুল্লাহ' খ্যাত খালিদ বিন ওয়ালিদের প্রতি রহম করুন। তিনি সেনাপতি হিসেবে সুনিপুণভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং সাধারণ সৈনিক হিসেবেও দায়িত্ব আদায়ে কোনো প্রকার ত্রুটি করেননি।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের নীতিমালায় এ বিষয়গুলোর প্রতি খুবই গুরুত্বারোপ করেছে। আত্মপ্রকাশের প্রবণতার বিষয়ে পরিপূর্ণরূপে সতর্ক করেছে। ফলে তাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশের প্রবণতা অনেকাংশে চূর্ণ হয়েছে।

এই তারবিয়াতের ফলে এ দলের মধ্যে এমন অনেক অজ্ঞাত সৈন্যের আবির্ভাব হয়েছে, যাদের চরিত্রে আল্লাহর রাসূলের নিম্নোক্ত বাণীর বাস্তব প্রতিফলন ঘটেছিল। হাদিসে নববিতে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَبْرَارَ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ، الَّذِينَ إِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا، وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يُعْرَفُوا

"নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা ভালোবাসেন সৎকর্মশীল, মুত্তাকি ও নিভৃতচারী লোকদের। যারা অনুপস্থিত থাকলে তাদের খোঁজা হয় না। আর উপস্থিত থাকলে তাদের চেনা যায় না।" আল-মুসতাদরাক আলাস সহিহাইন লিল হাকিম : ৪; ইবনে মাজাহ : ৩৯৮৯

www.bjilibrary.com

আমরা এমন কিছু ব্যক্তিকেও দেখেছি, যাদের মধ্যে আনসারদের স্বভাব পরিলক্ষিত হয়েছিল। ভীতিকর পরিস্থিতির সম্মুখীন হলে তারা সবাই এসে সমবেত হতো, জাগতিক সুবিধার সৃষ্টি হলে তারা সেখান থেকে কেটে পড়ত।

বহু লোক এমন আছে, যারা নাম উল্লেখ ব্যতিরেকে আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জানমাল উৎসর্গ করেছে। নিজেদের ব্যক্তিত্বের প্রকাশের জন্য তারা কোনো ঢাকঢোল পেটায়নি। কত যুবক ফিলিস্তিনে এবং সুয়েজ উপকূলে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ করে শাহাদাতবরণ করেছে। তারা কারও থেকে প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতার কোনো আশা করেনি। এমনকি নিজেদের নামও প্রকাশ করেনি এবং আত্মগরিমা বা আত্মপ্রবঞ্চনায় আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে তাদের বীরত্বগাথাও বর্ণনা করেনি।

অন্তরের খোরাক

ঈমান-আকিদার বিশুদ্ধির মাধ্যমে অন্তরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি অন্তরের জন্য খোরাকের ব্যবস্থা করতে হয়। আর অন্তরের খোরাক হলো আল্লাহ তায়ালার সাথে স্থায়ী ও পরিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা, আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করা, আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা এবং উত্তমরূপে আল্লাহর ইবাদত করা।

যে মৌলিক গুণাবলির ওপর ইখওয়ানের রাব্বানিয়্যাত শিক্ষার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে, সেগুলোর একটি হলো– আল্লাহর ইবাদত করা। কেননা, মানুষ ও জিন জাতিদ্বয়কে সৃষ্টির প্রধান উদ্দেশ্যই হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার ইবাদত। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

"নিশ্চয় আমি মানুষ ও জিন জাতিকে সৃষ্টি করেছি, যেন তারা আমার ইবাদত করে।" সূরা যারিয়াত : ৫৬

ইবাদত শব্দটি ব্যাপক, যা এমনসব কথা ও কাজকে অন্তর্ভুক্ত করে, যা দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি ও ভালোবাসা অর্জন করা যায়। তবে আমরা এখানে ইবাদতের বিশেষ অর্থ নিয়ে আলোচনা করব। আর তা হলো, আল্লাহ তায়ালার বিধানগুলো পালন করা, তাঁর স্মরণ ও কৃতজ্ঞতা আদায় করা এবং দ্বীনের প্রতীকী বিধানগুলো প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা।

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইবাদতের ক্ষেত্রে যে সকল মৌলিক উপাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে, সেগুলো হলো :

এক. সুন্নাতের অনুসরণ ও বিদআত বর্জন

ইবাদতের ক্ষেত্রে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরতে হবে এবং বিদআত থেকে বেঁচে থাকতে হবে। কেননা, প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি। এ সম্পর্কে সাইয়িদ সাবিক *ফিকহুস সুন্নাহ* শিরোনামে একটি চমৎকার কিতাব রচনা করেছেন। শহিদ ইমাম হাসান আল বান্না এই কিতাবের ভূমিকা লিখেছেন এবং এর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। ইতঃপূর্বে ইখওয়ানের সাপ্তাহিক ম্যাগাজিনে এই গ্রন্থের বিভিন্ন অংশ প্রকাশিত হয়। এই কিতাব শরিয়তের দলিলসমূহের ওপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে এবং ফিকহের ব্যাপারে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হয়েছে।

দুই. ফরজসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব

ফরজ ইবাদত ও বিধানসমূহের প্রতি ইখওয়ান সর্বাধিক জোর দিয়েছে। কেননা, আল্লাহর ফরজ বিধান আদায় না করা পর্যন্ত নফল ইবাদত কবুল করেন না। সহিহ বুখারিতে বর্ণিত এক হাদিসে কুদসিতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ.

"বান্দা যে সকল কাজের মাধ্যমে আমার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা চালায়, সেগুলোর মধ্য হতে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় হলো ওই কাজ, যা আমি তার ওপর ফরজ করেছি।" বুখারি : ৬৫০২

তাই কোনো অবস্থাতেই ফরজের ব্যাপারে অবহেলা বা অলসতা করা যাবে না।

তিন. জামায়াতে নামাজের তাকিদ

ইখওয়ান জামায়াতে নামাজ আদায়ে তাকিদ দেয়। কেননা, জামায়াতের সাথে ফরজ নামাজ আদায় করা ফকিহগণের মতপার্থক্য অনুসারে ফরজে আইন, ফরজে কিফায়া অথবা সুন্নাতে মুআক্কাদা। এ কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের নেতাকর্মীদের যখন 'তুর' কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়, তখন তারা অতি দ্রুত জেলখানার একটি অংশকে নামাজের জায়গা হিসেবে নির্ধারণ করে নেয়,

www.bjilibrary.com

যেখানে প্রতি ওয়াক্তের নামাজের জন্য তারা একত্রিত হতো, এমনকি তারা কারাভ্যন্তরে জুমার নামাজও আদায় করত। উসতায মুহাম্মাদ আল গাযালির সেই কণ্ঠ আমার সব সময় মনে পড়ে, যখন তিনি প্রতি ওয়াক্তের নামাজে আমাদের ইমামতি করতেন এবং শেষ রাকাতে কুনুতে নাযেলা হিসেবে এই দুআ পাঠ করতেন–

اللهم فك بقوتك اسرنا، واجبر برحمتك كسرنا، وتول بعنايتك أمرنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا.

"হে আল্লাহ! আপনার শক্তি দ্বারা আমাদের বন্দিদশা থেকে মুক্তি দান করুন। আপনার রহমত দ্বারা আমাদের ভাঙনকে জুড়ে দিন। আপনার তত্ত্বাবধানে আমাদের কাজ সম্পন্ন করে দিন। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দোষগুলো ঢেকে দিন এবং ভয় থেকে আমাদের নিরাপত্তা দান করুন।"

চার. নফল ইবাদতে উৎসাহ

হাদিসে কুদসিতে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ.

"বান্দা নফল ইবাদত দ্বারা আমার নৈকট্য অর্জন করতে থাকে, এমনকি একপর্যায়ে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি।" বুখারি : ৬৫০২

এই দাওয়াতি তৎপরতায় এমন কত লোক যে তৈরি হয়েছে, যারা দিনে রোজা রাখত এবং রাত জেগে নফল ইবাদত করত। যেন তারা আল্লাহর সেই বাণীরই প্রতিবিম্ব, যেখানে তিনি বলেছেন–

﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا...﴾ (١٦)

"তারা শয্যা ত্যাগ করে ভয় ও আশা নিয়ে তাদের রবকে ডাকে।"
সূরা সাজদা : ১৬

'তারা হলো রাতের সন্ন্যাসী এবং দিনের অশ্বারোহী'– সাহাবায়ে কেরাম ও তাদের অনুসারীগণকে মানুষ এই বিশেষণে বিশেষায়িত করে। ইখওয়ানের অনেক জনশক্তি এই বৈশিষ্ট্যের অনুগামী হতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছে এবং

www.bjilibrary.com

অনেকেই সফল হয়েছে। ইখওয়ানদের কেউ একজন নিজের ভাষায় 'হুআল হাক' নাশিদে অথবা 'আল-কাতাইব' নাশিদে বলেছেন, যা প্রায় সকলেরই মুখস্থ আছে–

رقاقٌ إذا ما الدُّجى زارنا غمرنا محاريبَنا بالحَزَنْ
وجندٌ شداد إذا رامنا لبأسٍ رأى أُسُدًا لا تُهَنْ

যখন আমাদের ওপর অন্ধকার ছেয়ে যায়,
তখন আমরা দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে মিহরাবে নীত হই।
আবার যুদ্ধের ঘোষণা হলে শক্তিশালী সেনাবাহিনীতে রূপান্তরিত হই,
যেখানে এমন সিংহের আবির্ভাব হয়, সেখানে দুর্বলতার ছাপ নেই।

এক্ষেত্রে উসতায মুরশিদ হাসান আল বান্না তাঁর *আল-মুনাজাত* পুস্তিকায় শেষ রাতে তাহাজ্জুদ নামাজের ফজিলত, দুআ ও ইসতিগফারের উপকারিতা এবং এ সম্পর্কিত আয়াত, হাদিস ও বুযুর্গদের বাণীসমূহ উল্লেখ করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্না নিম্নোক্ত ভালো গুণগুলোর প্রতি খুব বেশি গুরুত্বারোপ করেছেন– শেষ রাতের ইবাদত, যখন মানুষ ঘুমিয়ে থাকে, তখন আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়া। যখন লোকেরা অনর্থক ক্রিয়া-কাজে লিপ্ত থাকে, তখন আল্লাহর আনুগত্যে রাত্রিজাগরণ। যখন সীমালঙ্ঘনকারীরা আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকে, তখন সৎকর্মশীলদের আল্লাহর ভয়ে কাঁদা। অনেক সময় তিনি স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে মুনাজাতের মধ্যে জনৈক কবির এ কবিতাও আবৃত্তি করতেন–

سهر العيون لغير وجهك باطل ** وبكاؤهن لغير فقدك ضائعٌ

তোমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য ছাড়া রাত্রিজাগরণ যে শুধুই বাতিল।
তোমাকে হারানোর ভয় ছাড়া অন্য কারণে ক্রন্দন যে শুধুই নিষ্ফল।

অপর এক কবি বলেছেন–

إن قلبا أُنت ساكنه ** غير محتاج إلى السرج
وجهك المأمول حجتنا ** يوم يأتي الناس بالحجج

যে অন্তরে তোমার বসবাস,
তাতে প্রদীপের নেই কোনো প্রয়োজন।
তোমার পরম কাঙ্ক্ষিত চেহারাই আমাদের দলিল,
যেদিন মানুষ তাদের দলিলসমূহ নিয়ে উপস্থিত হবে।

www.bjilibrary.com

এ তাৎপর্য ও তাকিদ ইখওয়ানদের মন ও মননে গভীর প্রভাব সৃষ্টি করে। ফলে এমন এক খোদাপ্রেমী প্রজন্মের সৃষ্টি হয়, যারা আল্লাহর ভালোবাসায় কিয়ামুল লাইল (রাতের নামাজ) ও সিয়ামুন নাহারে (দিনের রোজায়) অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। রাতের নামাজ থেকে প্রবল শীতও তাদের বিরত রাখতে পারে না এবং গ্রীষ্মের কাঠফাটা রোদও তাদেরকে রোজা থেকে নিবৃত্ত করতে পারে না। কারণ, তারা তাদের রবের ইবাদতে খুঁজে পেয়েছে জান্নাতি স্বাদ, তাঁর আনুগত্যে পেয়েছে অমীয় সুধা এবং তাঁর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ায় পেয়েছে সৌভাগ্যের সোপান। আমাদের একজন পূর্বসূরি এই ঈমানি মজাকে এ ভাষায় ব্যক্ত করেছেন–

لو علم بها الملوك لجادلونا عليها بالسيوف.

"যদি রাজা-বাদশাহরা আমাদের এ সুখানুভূতি সম্পর্কে জানত, তাহলে এটা লাভ করার জন্য তারা তরবারি নিয়ে আমাদের সাথে লড়াইয়ে লিপ্ত হতো।"

আমি এখনও স্মরণ করি তুর কারাগারে বন্দিদের তাহাজ্জুদের জামায়াতের কথা, যখন ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কিছু সদস্য রাতের শেষ প্রহরে নামাজের জন্য জাগাতে এই বলে আওয়াজ দিত–

يا نائما مستغرقا في المنام ** قم فاذكر الحي الذي لا ينام

مولاك يدعوك إلى ذكره ** وأنت مشغول بطيب المنام

হে ঘুমে নিমগ্ন ব্যক্তি, ওঠো!
সেই সত্তাকে স্মরণ করো, যিনি চিরঞ্জীব, কখনও ঘুমান না।
তোমার প্রতিপালক তোমাকে তাঁর যিকিরের দিকে ডাকছেন,
আর তুমি সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন!

এ ডাকে ঘুমন্তরা জেগে উঠত, কুঁড়ে প্রকৃতির লোকদের মনেও ভয় জাগত, অলসরাও তৎপর হয়ে যেত, যেন তারা রাতের শেষভাগের বরকতময় সময়টুকুতে আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হতে পারে এবং ক্ষমাপ্রার্থনাকারীদের কাতারে শামিল হয়ে এ সময়ের বরকত লাভে ধন্য হতে পারে।

এই ছিল ইমাম হাসান আল বান্নার পাঠশালা! এটি ছিল রাতের বিদ্যাপীঠ– যেখানে নামাজ, দুআ, তিলাওয়াতে কুরআন সবকিছুই ছিল। আর ছিল রুহের

www.bjilibrary.com

পাথেয় এবং অন্তরের খোরাক। এ পাঠশালার মাধ্যমে এমন মুসলিম তৈরি হয়, যারা আমানতদারি ও মজবুতির সাথে সর্বত্র নবুওয়তের উত্তরাধিকার এবং রিসালাতের দায়িত্ব বহন করে চলে। এ ছিল মহান দায়িত্ব পালনের প্রস্তুতি, যে দায়িত্বের সূচনা করেছেন মানবতার মুক্তির দূত নবি কারিম সা., যাকে মাক্কি যুগে দ্বীনি দাওয়াতের প্রারম্ভিককালে মহান আল্লাহ সম্বোধন করেছিলেন–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ﴿١﴾ قُمِ ٱلَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿٢﴾ نِّصْفَهُۥٓ أَوِ ٱنقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ﴿٣﴾ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ ٱلْقُرْءَانَ تَرْتِيلًا ﴿٤﴾ إِنَّا سَنُلْقِى عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴿٥﴾

"হে বস্ত্রাবৃত! রাত্রি জাগরণ করো, কিছু অংশ ব্যতীত। অর্ধরাত্রি কিংবা তার চেয়ে কিছুটা কম। অথবা তার চেয়ে কিছুটা বেশি। আর কুরআন আবৃত্তি করো ধীরে ধীরে সুস্পষ্টভাবে। নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি গুরুভার বাণী।" সূরা মুযযাম্মিল : ১-৫

পবিত্র কুরআনের এ নৈশপাঠের মাধ্যমে এমন কিছু আল্লাহওয়ালা তরুণের আবির্ভাব হয়েছে– যারা আমাদের মহান পূর্বসূরিদের চরিত্রকে আমাদের সামনে নতুন করে জাগরুক করেছে। আমরা এ সকল আল্লাহওয়ালা যুবককে দেখেছি, তারা জীবনভর নিয়মিত সোমবার ও বৃহস্পতিবার রোজা রেখেছে। আল্লাহ তায়ালা তাদের মাধ্যমে আমাদের অনুপ্রাণিত ও উপকৃত করুন। তারা জিহাদের ময়দানেও এ সুন্নাতের ওপর আমল অব্যাহত রেখেছে। মূলত এর মাধ্যমে তারা নবিজি সা.-এর অপর একটি হাদিসের ওপর আমল করেছে। হাদিসটি হলো–

مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ، بَاعَدَ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

"যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোজা রাখবে, আল্লাহ এর বিনিময়ে তার চেহারাকে জাহান্নাম থেকে সত্তর বছর দূরে রাখবেন।"
বুখারি : ২৮৪০; মুসলিম : ১১৫৩

ইখওয়ানের এক কর্মী যুদ্ধের ময়দানে আহত হয়। অতঃপর তার কাছে পানি আনা হয়, তখন সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগের অপেক্ষা করছিল। কিন্তু সে পানি গ্রহণ না করে বলল–

"আমাকে আমার আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। আমি রোজা অবস্থায় আমার রবের সাথে সাক্ষাৎ করতে আগ্রহী।"

www.bjilibrary.com

পাঁচ. যিকিরের প্রতি উদ্‌বুদ্ধকরণ

আল্লাহর যিকিরের প্রতি উদ্‌বুদ্ধকরণে ইখওয়ান গুরুত্বারোপ করে। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ﴿٤١﴾ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤٢﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা বেশি করে আল্লাহকে স্মরণ করো এবং সকাল-সন্ধ্যা তাঁর তাসবিহ পাঠ করো।" সূরা আহযাব : ৪১-৪২

আর সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে কুরআনের তিলাওয়াত– যা আল্লাহ তায়ালার প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণী। কুরআন তিলাওয়াতকারীকে প্রতিটি হরফের বিনিময়ে দশটি করে নেকি প্রদান করা হয়। তাজবিদ সহকারে সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াতে ইখওয়ানদের উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। সেই তিলাওয়াত যেন গভীর চিন্তা ও মনোযোগের সাথে হয়, তাতে দেওয়া হয় বিশেষ তাকিদ। যদি তিলাওয়াতে কুরআনের মাধ্যমে পাহাড়কে গতিশীল করা যেত অথবা জমিনকে বিদীর্ণ করা যেত কিংবা মৃতদের সাথে কথা বলা যেত, তাহলে এই তিলাওয়াতই যেন হয় তার উপযুক্ত।

যিকিরের বহু ধরন রয়েছে এবং তার শব্দাবলিও প্রচুর। যেমন– সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার। এ ছাড়াও আছে বিভিন্ন প্রকার দুআ, ইসতিগফার, নবিজি সা.-এর প্রতি দুরুদ পাঠ ইত্যাদি।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শিক্ষানীতিতে হাদিসে বর্ণিত দুআ ও যিকিরসমূহের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কেননা, হাদিসে বর্ণিত শব্দাবলির মাধ্যমে দুআ ও যিকির বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর কয়েকটি দিক হলো–

হাদিসে বর্ণিত শব্দমালার মর্ম ও শৈলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও সমতুল্য কোনো শব্দমালা নেই। বস্তুত হাদিসের শব্দাবলি তার ব্যাপকতা, অলংকার, দ্ব্যর্থহীনতা ও প্রভাবক শক্তির দিক থেকে আল্লাহর তায়ালার একটি বিশেষ নিদর্শন। উপরন্তু এগুলো রাসূল সা.-এর মুখনিঃসৃত বাণী হিসেবে নববি বরকতে পূর্ণ।

নবি-রাসূলগণই একমাত্র মাসুম। অতএব, তাদের মুখনিঃসৃত শব্দাবলির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। অন্যান্য সকল ব্যক্তিবর্গ যত উচ্চমর্যাসম্পন্নই হোন না কেন– মাসুম নন। সুতরাং যে ব্যক্তি নিষ্পাপ নন, তার কথা

www.bjilibrary.com

অনেক ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন ও শৈথিল্যের শিকার হওয়া স্বাভাবিক। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাতে সমালোচনার সুযোগ থাকে। এজন্য বিতর্কযুক্ত কথা পরিহার করে বিতর্কমুক্ত কথাকেই গ্রহণ করা উচিত।

হাদিসে বর্ণিত দুআ পাঠে দুই ধরনের সওয়াব পাওয়া যায় : এক. যিকিরের সওয়াব। দুই. নবিজি সা.-এর অনুসরণের সওয়াব। কাজেই কোনো বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সংগত কারণ ছাড়া নবিজিকে অনুসরণের সওয়াব থেকে বঞ্চিত হতে চাইবে না।

এ কারণে শহিদ ইমাম হাসান আল বান্না হাদিসের গ্রন্থাবলি হতে সংগৃহীত দুআ ও যিকির-সংবলিত একটি পুস্তিকা রচনা করেন, তিনি এর নামকরণ করেছেন *আল-মাছুরাত*। মূলত ইমাম নববি রচিত *আল-আযকার* এবং শায়খুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রচিত *আল-কালিমুত তাইয়িব*-এর আলোকে তিনি এ পুস্তিকা রচনা করেন।[৩]

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সকল কর্মীর কাছেই এ পুস্তিকা রয়েছে। আর এটা প্রায় সকলের মুখস্থও আছে। কারণ, তারা সকাল-সন্ধ্যা এ দুআ ও ওযিফাসমূহ পাঠ করে। ইখওয়ানের কিছু সদস্য এমনও আছে, যারা প্রতিটি দুআ প্রয়োজনের সময় স্মরণের জন্য কিছু সুন্দর পন্থা অবলম্বন করেছেন। যেমন– ঘুমাবার ঘরে একটি ফলকে ঘুমানো ও ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার দুআ, খাবার ঘরে আরেকটি ফলকে পানাহারের দুআসমূহ, ঘরের দরজায় ঘরে প্রবেশ ও বাহির হওয়ার দুআ এবং ব্যক্তিগত গাড়িতে আরোহণের দুআ-সংবলিত স্টিকার লাগিয়ে রাখে। এমনিভাবে তারা অন্য সকল দুআ স্মরণের ব্যবস্থা করে।

ছয়. মুহাসাবা

ইখওয়ানুল মুসলিমিন নিজেদের মধ্যে দ্বীনি চেতনাকে জাগ্রত করা, ব্যক্তিসত্তার উন্নয়ন এবং নফসে লাওয়ামাকে নফসে আম্মারার[৪] ওপর বিজয়ী করতে যে সকল পন্থা গ্রহণ করে, সেগুলোর একটি হলো– 'মুহাসাবা' বা হিসাব গ্রহণ।

---

৩. পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ 'ইমাম হাসান আল বান্নার ওযিফা' শিরোনামে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে। –অনুবাদক

৪. নফসে লাওয়ামা হলো– মন্দ কাজের তিরস্কারকারী প্রবৃত্তি। আর নফসে আম্মারা হলো– মন্দ কাজের দিকে প্ররোচিতকারী প্রবৃত্তি। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

আর তা হলো, এমন কিছু প্রশ্নের তালিকা– যা একজন ব্যক্তি নিজেকে উদ্দেশ্য করে করবে এবং এর উত্তর দেবে শুধু 'হ্যাঁ' বা 'না' দ্বারা। দিন শেষে বিছানায় ঘুমোতে যাওয়ার সময় এ সকল প্রশ্ন করবে। যেন আত্মপর্যালোচনাকারী ব্যক্তির কাছে এর দ্বারা সারাদিনের অর্জনগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়। এর মাধ্যমে সে ওই দিনের সফলতা-ব্যর্থতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে। এ হিসাব-নিকাশ সম্পন্ন হবে তার নিজের সত্তা ও অন্তরের মধ্যে। মহান আল্লাহ ছাড়া এর তৃতীয় কোনো সাক্ষী থাকবে না।

আত্মজিজ্ঞাসার সেই প্রশ্নগুলো হতে নমুনাস্বরূপ কয়েকটি হলো–

১. আজ সব নামাজ সময়মতো আদায় করেছ কি?

২. নামাজগুলো কি জামায়াতের সাথে আদায় করেছ?

৩. আজ কুরআনের নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াত করেছ কি?

৪. হাদিস শরিফে বর্ণিত দুআসমূহ পাঠ করেছ কি?

৫. আজ আল্লাহর জন্য কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করেছ কি?

রাব্বানিয়্যাতের ঈমানি এ শিক্ষার ফলে ইখওয়ানুল মুসলিমিন দাওয়াতের পথে এবং দেশের স্বার্থে বিশাল অবদান রাখতে পেরেছে। কিন্তু তারা এটিকে কারও প্রতি নিজেদের অনুগ্রহ মনে করেনি; বরং তারা বিশ্বাস করে– আল্লাহ তায়ালা ঈমানের হিদায়াত দান করে তাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন।

জামাল আবদুন নাসের ও তার প্রভাবাধীন শাসনামলে (১৯৪৮, ১৯৫৪, ১৯৬৫ সালে) ইখওয়ানুল মুসলিমিন অনবরত জুলুম ও সীমাহীন দুঃখ-কষ্টের শিকার হয়। কিন্তু আল্লাহর পথে এ দুঃখ-কষ্টের জন্য তারা হীনবল হয়নি, দুর্বল হয়নি কিংবা নতিস্বীকারও করেনি। এমনকি তাদের প্রতি হিংস্র কুকুর লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অনেকের পিঠে উত্তপ্ত লোহা দিয়ে ছ্যাঁকা দেওয়া হয়েছে। অনেকের দেহকে করা হয়েছে চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত। অনেকে ভোগ করেছে পূর্ণ বিশ বছরের কারাদণ্ডও। অনেককে জনসম্মুখে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে; যেমনটি লিমানতুরার বধ্যভূমিতে ঘটেছে। আবার অনেকে গুপ্তহত্যার মুখোমুখি হয়েছে। এ সকল মজলুম দাঈগণ ইতিহাসের সোনালি পাতায় স্থান করে নিয়েছেন। তাদের কাউকে কাউকে হত্যা করা হয়েছে বিচারিকভাবে– অন্যায় ফাঁসির দণ্ডাদেশ দিয়ে; অথচ তারা এমন কোনো অপরাধ করেননি যে, যার দোষে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যায়। যেমন– ইসলাম গ্রহণের পর কুফরি করা অথবা

www.bjilibrary.com

বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া কিংবা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা। বরং তাদের অপরাধ ছিল কেবল একটাই; আর তা হলো, এ কথা বলা যে– ربي الله ودستوري القران–'আমার রব আল্লাহ, আমার সংবিধান কুরআন'।

মানুষের গুনাহে লিপ্ত হওয়া আশ্চর্যের বিষয় নয়; বরং আশ্চর্যের বিষয় হলো– অনবরত গুনাহ করতে থাকা এবং কৃত গুনাহ থেকে তাওবা না করা। সাইয়িদুনা আদম আ.ও ভুল করেছেন, কিন্তু সাথে সাথে তিনি আল্লাহর দরবারে তাওবা করেছেন এবং আল্লাহ তায়ালা তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

...وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾

"আদম তাঁর রবের আদেশ অমান্য করলেন, ফলে তিনি বিচ্যুত হলেন। অতঃপর তাঁর রব তাকে মনোনীত করলেন এবং তাকে পথনির্দেশ করলেন।" সূরা তহা : ১২১-১২২

বিপরীতে ইবলিসও পাপ করেছে, কিন্তু তাকে ক্ষমা করা হয়নি। কারণ, সে গুনাহ থেকে তাওবা করেনি এবং আপন রবের কাছে নিজের অপরাধ স্বীকার করেনি। বরং সে বিনয়ী হতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং দম্ভ ও অহংকারে লিপ্ত হয়েছে। উলটো সে বলেছে–

...أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ﴿١٢﴾

"আমি তার থেকে উত্তম। আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে।" সূরা আরাফ : ১২

অথচ একই সময় সাইয়িদুনা আদম আ. ও তাঁর স্ত্রীর বক্তব্য ছিল–

...رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿٢٣﴾

"হে আমাদের রব! আমরা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছি। আপনি যদি আমাদের ক্ষমা না করেন, আমাদের প্রতি রহম না করেন, তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।" সূরা আরাফ : ২৩

আদম আলাইহিস সালাম ও তাঁর স্ত্রীর বিচ্যুতি ছিল আকস্মিক অসর্তকতার ফল, যার পরিণতি ছিল বিশুদ্ধ তাওবা। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তাদের তাওবা কবুল করেন এবং ক্ষমা করে দেন। বিপরীতে ইবলিসের অপরাধ ছিল–

www.bjilibrary.com

আল্লাহর অবাধ্যতা, তাঁর আদেশ অমান্যকরণ এবং তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন। এর পরিণতিতে আল্লাহ তায়ালা ইবলিসকে ধিক্কৃত অবস্থায় তাঁর রহমত থেকে বিতাড়িত করেন এবং বিচার দিবস পর্যন্ত তার প্রতি অভিসম্পাত করেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরাও আদম সন্তান ও মানুষ। কাজেই তাদের মধ্যে যদি এমন কিছু লোক পাওয়া যায়, যারা ভুল করে এবং তাদের যে বিষয়ের আদেশ করা হয়েছে, তা অমান্য করে অথবা নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়– তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। তবে সর্বোত্তম ভুলকারী তারাই, যারা তাওবা করে এবং অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থনা করে। তা ছাড়া অন্তরের আরোগ্যের জন্য তাওবাই হচ্ছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা।

বিশুদ্ধ তাওবা ও খাঁটি মনে ইসতিগফারের জন্য পূর্বশর্ত হলো– কৃত অপরাধের অনুভূতি, আল্লাহর শাস্তির ভয়, প্রকৃত দাসত্বের মাধ্যমে তাঁর দরবারে কাকুতি-মিনতি করা এবং গুনাহের স্বীকারোক্তির মাধ্যমে বিনয়াবনত হওয়া।

এসব কিছু সত্ত্বেও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মীরা যেসব কষ্টের সম্মুখীন হয়েছে এবং যেসব ত্যাগ স্বীকার করেছে, সবকিছুকে তারা আল্লাহ তায়ালার জন্য নিবেদন করেছে। কেননা, তারা তো নিজেদের জীবন বিক্রয় করে দিয়েছে এবং আল্লাহ চাহে তো এর বিনিময়ে তাদের জন্য রেখেছেন জান্নাত। তারা কখনও তাদের এ চুক্তি প্রত্যাহার করেনি অথবা এ চুক্তি থেকে ফিরে আসেনি। আর তারা কখনও এমনটি করবেও না এবং জান্নাতের পরিবর্তে কোনো বিনিময় গ্রহণ করবে না, ইনশাআল্লাহ।

এ কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন ওই সকল লোক থেকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উঠেপড়ে লেগে থাকেনি, যারা তাদের বন্দি করে নানা ধরনের শাস্তি দিয়েছে, তাদের সহায়সম্পদ বাজেয়াপ্ত করেছে, বন্দি অবস্থায় ক্ষুধার্ত রেখেছে, গোপনে ও প্রকাশ্যে হত্যা করেছে। এমনকি কেউ কোনোদিন এমনও শোনেনি যে, ইখওয়ান কোনো জল্লাদকে গুম করেছে কিংবা তাদের ডান চোখে বা বাম চোখে গুলি করেছে; অথচ ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কর্মীরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছুই করতে পারত। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মধ্যে প্রশিক্ষিত এমন অনেক কর্মী ছিল– যারা যুদ্ধের সময় জালিম ইহুদিদের সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল এবং ইংরেজদের ঘুম হারাম করে দিয়েছিল। কিন্তু তাদের তারবিয়াতই তাদেরকে নিজেদের দেশে ও সমাজে হঠকারি পদক্ষেপ নেওয়া থেকে হিফাজত করেছে।

www.bjilibrary.com

তারা তাদের জালিম প্রতিপক্ষকে অনেক ক্ষেত্রেই আল্লাহর হাতে সঁপে দিয়েছে। অতঃপর মহান আল্লাহই তাদের থেকে এক এক করে প্রতিশোধ নিয়েছেন। এমনকি তাদের অনেকেই আখিরাতের শাস্তির পূর্বেই দুনিয়াতে কঠিন শাস্তি পেয়েছে। আর আল্লাহর কাছে যে শাস্তি আছে, তা তো অতিশয় তীব্র ও লাঞ্ছনাকর।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের অনেক অত্যাচারীর পরিণতি স্বচক্ষে দেখেছে, তারা চরম লাঞ্ছনা ও অবমাননার শিকার হয়েছে। তাদের কেউ পাগল অথবা দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়েছে। আবার অনেকে নির্মমভাবে নিহত হয়েছে। এমনকি উসতায হাসান আল হুদায়বি রহ., যিনি দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন, তিনি দেখেছেন– যে সমস্ত লোক তাকে বন্দি করেছিল, কালের আবর্তে তারাই ইখওয়ানের সদস্যদের সাথে জেলখানায় প্রবেশ করেছে। কিন্তু তারা জেলখানায় প্রবেশ করেছিল শিশুদের মতো ক্রন্দনরত অবস্থায়, আর ইখওয়ানের সদস্যরা তখন তাদের বীরের হাসি দিয়ে বরণ করে নিয়েছিল।

এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে, ইখওয়ানের সকল সদস্য খোদাভীতির ক্ষেত্রে সমপর্যায়ের। বরং বাস্তবতা হচ্ছে, ইখওয়ানের অধিকাংশ সদস্যের মধ্যে খোদাভীতির প্রভাব প্রবল ছিল এবং এটি তাদের চরিত্রে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। এ কারণে আল্লাহর আনুগত্যই হলো তাদের মূলনীতি এবং নাফরমানি হলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা। কেননা, ইখওয়ানের কর্মীরা তো প্রবৃত্তির ছোটো ছোটো চাহিদাকে বর্জন করে বড়ো আশা নিয়ে ব্যস্ত। দুনিয়ার লালসা ছেড়ে আখিরাতের চিন্তায় বিভোর এবং ব্যক্তিস্বার্থ ছেড়ে সামগ্রিক কল্যাণচিন্তায় মগ্ন। শয়তান তাদের মধ্য হতে কাউকে কখনও পদস্খলিত করলেও পরক্ষণেই তার অন্তরাত্মা জেগে ওঠে, হৃদয় প্রকম্পিত হয় এবং সে তার রবের কাছে লজ্জিত হয়ে কান্নাকাটি করে তাওবা করে।

আমার এখনও এক যুবকের কথা স্পষ্ট মনে আছে। সে সবেমাত্র যৌবনের মৌবনে উপনীত হয়েছিল। কোনো একদিন অসতর্কতার মুহূর্তে হঠাৎ তার স্বভাবজাত প্রবৃত্তি প্রবল হয়ে ওঠে এবং তা তাকে গুনাহে লিপ্ত করে। কিন্তু পরক্ষণই সে সংবিৎ ফিরে পায় যে, আমি তো পবিত্রতা অর্জনের পর নিজেকে কদর্যতায় জড়িয়েছি এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছি। হিদায়াত লাভের পর ভ্রষ্টতায় নিপতিত হয়েছি। এভাবে আল্লাহর আনুগত্যের মিষ্টস্বাদ অনুভবের পর এখন সে গুনাহের তিক্ততা অনুভব করল। অতঃপর সে নিজেকে ঘরে

www.bjilibrary.com

আবদ্ধ করে নিজের অবস্থার জন্য কান্নাকাটি করতে থাকে এবং চরম অস্থিরতার মধ্যে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে থাকে। পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তা তার জন্য সংকীর্ণ হয়ে যায়। তখন তার নিজেকেই নিজের কাছে বোঝা মনে হতে থাকে। ফলে সে আপন পালনকর্তার প্রতি লজ্জা, নিজের প্রতি অনুতাপ এবং লোকজনের দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করার জন্য ঘর থেকে বের হতো না এবং কারও সাথে সাক্ষাৎ করত না। অথচ আমি ছাড়া কেউ জানত না যে আসলে তার কী হয়েছে! আমি জানতাম; কারণ, সে আমাকে বিষয়টি অবহিত করেছিল। অতঃপর আমি পত্র লিখে তাকে আল্লাহ তায়ালার ক্ষমার ব্যাপারে আশান্বিত করি এবং তাওবার পথ ও পদ্ধতি বাতলে দিই। আমি তাকে রাসূলে কারিম সা.-এর এই হাদিসটি কথা স্মরণ করিয়ে দিই–

مَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ.

"যার সৎ কাজ তাকে আনন্দিত করে এবং মন্দ কাজ তাকে ব্যথিত করে সেই প্রকৃত মুমিন।" হাকিম : ৩৫

সাইয়িদুনা আলী রা. বলেন–

سيئة تسوؤك خير من حسنة تعجبك.

"যে মন্দ কাজ তোমাকে ব্যথিত করে, তা ওই ভালো কাজ থেকে উত্তম, যা তোমাকে অহংকারী করে।"

ইবনে আতাউল্লাহ রহ. বলেন–

"কখনও তোমার জন্য আনুগত্যের দরজা খোলা হয়; কিন্তু আমল কবুল হওয়ার দরজা খোলা হয় না। আবার কখনও তোমার একটি গুনাহই মনজিলে মাকসুদে পৌঁছার উপলক্ষ হয়। কেননা, যে গুনাহ বিনয় ও অপরাধবোধ সৃষ্টি করে, তা ওই নেকি থেকে উত্তম– যা আত্মগরিমা ও অহংকার সৃষ্টি করে।"

***

www.bjilibrary.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বজনীনতা

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম শিক্ষার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো– পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বজনীনতা। ইসলামের পূর্ণাঙ্গতা ও ব্যাপকতাকে ইখওয়ানুল মুসলিমিন যথাযথভাবে অনুধাবন করেছে এবং তাদের কর্মক্ষেত্রে এর বাস্তব প্রয়োগ ঘটিয়েছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের তালিম-তারবিয়াতে মানবজীবনের সামগ্রিকতাকে ধারণ করেছে, ইসলামের ব্যাপকতাকে অবলম্বন করেছে। মানবজীবনের কোনো একটি বিশেষ দিকের ওপর তারা নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গিকে সীমাবদ্ধ করেনি। ইসলামের বিশেষ কোনো একটি শিক্ষা নিয়েই কেবল পড়ে থাকেনি। কোনো একটি বিশেষ বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করেই ইখওয়ান ক্ষান্ত হয়নি, যেমনটি বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞগণ করে থাকেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের পূর্ণ মনোযোগ কেবল আত্মিক বা চারিত্রিক পরিশুদ্ধির প্রতি নিবদ্ধ করেনি, যেমনটি সুফি ও নীতিশাস্ত্রবিদগণ করে থাকেন। অনুরূপভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিন সকল প্রচেষ্টাকে চিন্তাশীলতার ওপর সীমিত করেনি, যেমনটি দার্শনিক ও যুক্তিবাদীগণ করে থাকেন। এমনিভাবে শরীরচর্চা ও সামরিক প্রশিক্ষণকে ইখওয়ান তাদের প্রধান কাজ বানায়নি, সৈনিকরা যার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। এমনিভাবে সমাজবিজ্ঞানকে ইখওয়ান তাদের সকল তৎপরতার কেন্দ্রবিন্দু বানায়নি, যেমনটি সমাজ সংস্কারকগণ করে থাকেন। বরং বাস্তবতা হচ্ছে– ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই সকল বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছে এবং এ জাতীয় সকল প্রকার শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেছে।

ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে, মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগের পূর্ণাঙ্গ তারবিয়াত প্রয়োজন– যা তার জ্ঞান, বিবেক-বুদ্ধি, অন্তর-দেহ, চরিত্র ও জীবনাচার সবকিছুকে অন্তর্ভুক্ত করবে। এ তারবিয়াত ব্যক্তিকে জীবনের সুখ-দুঃখ,

www.bjilibrary.com

আনন্দ-বেদনা, যুদ্ধ ও নিরাপত্তা সবকিছুর জন্য মানসিকভাবে তৈরি করে; সমাজে ভালো-মন্দ, তিতা-মিঠা সকল পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে প্রস্তুত করে। এ কারণে জিহাদের তারবিয়াত যেমন জরুরি ছিল, তেমনি সমাজবিজ্ঞান শিক্ষার প্রতি গুরুত্বারোপ করাও জরুরি ছিল। যাতে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জনশক্তিরা বসবাস করছে এক উপত্যকায় আর সমাজের অন্যান্যরা বসবাস করছে ভিন্ন উপত্যকায়।

আর এ পূর্ণাঙ্গতা ও সর্বজনীনতা ইসলামেরই অনন্য বৈশিষ্ট্য, যেখানে আকিদা-বিশ্বাস, ইবাদত-আমল, আইনকানুন ও শিক্ষা-দীক্ষা ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। যেসব বিষয় শিক্ষার প্রতি ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করেছে, বক্ষ্যমাণ পুস্তিকায় আমরা সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করব।

আর রাব্বানিয়্যাত বা আধ্যাত্মিকতার বিষয়ে আমরা স্বতন্ত্র শিরোনামে আলোচনা করেছি। সেখানে এর গুরুত্বের ব্যাপারেও আলোচনা করেছি যে, এটি ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হওয়ার দাবিদার; বরং বলা যায়– এটিই হচ্ছে তার প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য।

জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা

ইসলাম জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ওপর খুবই গুরুত্ব দিয়েছে, তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিনও এ বিষয়ে দিয়েছে বিশেষ মনোযোগ। কেননা, আল্লাহ তায়ালা নবি মুহাম্মাদ সা.-এর ওপর সর্বপ্রথম যে আয়াতটি অবতীর্ণ করেছেন তা হলো–

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ...﴾

"পড়ো তোমার প্রভুর নামে।" সূরা আলাক : ১

ইসলাম এমন দ্বীন– যা বুদ্ধিমত্তাকে সম্মান করে। এমনকি ইসলাম বিবেক-বুদ্ধিকে শরয়ি বিধান আরোপের মানদণ্ড হিসেবে বিবেচনা করেছে এবং শাস্তি ও প্রতিদানের ভিত্তি নির্ধারণ করেছে। কুরআন মাজিদ এ ধরনের দৃষ্টান্তে পরিপূর্ণ। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿...أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾

"তোমরা কি বোঝো না?" সূরা বাকারা : ৪৪

www.bjilibrary.com

...أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿٥٠﴾

"তোমরা কি চিন্তা-ভাবনা করো না?" সূরা আনআম : ৫০

...لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

"বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" সূরা নাহল : ৬৭

...لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" সূরা রুম : ২১

...لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

"বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।" সূরা আলে ইমরান : ১৯০

...لِّأُولِي النُّهَىٰ ﴿٥٤﴾

"বুদ্ধিমানদের জন্য।" সূরা তহা : ৫৪

এ কারণে ইসলামের দৃষ্টিতে চিন্তা-গবেষণা হলো ইবাদত। আর দলিল অনুসন্ধান করা ওয়াজিব। এমনকি ইলম অর্জন করা ফরজ। এর বিপরীতে নিষ্ক্রিয় থাকা নিন্দনীয় এবং অন্ধ অনুসরণকে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়।

কাজেই ইসলাম চায়– প্রত্যেক মুসলিম যেন অন্তর্দৃষ্টি সহকারে তার রবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং বিচক্ষণতার সাথে তাঁর দিকে মানুষকে ডাকে।

...عَلَىٰ بَصِيرَةٍ...﴿١٠٨﴾

"স্বজ্ঞানে।" সূরা ইউসুফ : ১০৮

কেননা, ইসলাম অন্ধবিশ্বাসকে গ্রহণ করে না এবং ওই ব্যক্তির প্রতিও পুরোপুরি সন্তুষ্ট নয়, যে মানুষের দেখাদেখি ঈমান আনয়ন করে, যেন সে অন্যের মাথা দিয়ে চিন্তা করে, সুস্পষ্ট প্রমাণ ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অন্যের অনুসরণ করে এবং অন্যের দ্বারা পরিচালিত হয়। বরং প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে, চিন্তা-ভাবনা করে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। হাদিস শরিফে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ.

"আল্লাহ যার ব্যাপারে কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তাকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করেন।" বুখারি : ৭১

www.bjilibrary.com

অতএব, এটি আশ্চর্যের কোনো বিষয় নয় যে, ঈমানি বা আত্মিক শিক্ষার সাথে যৌক্তিক শিক্ষাও আবশ্যক। কেননা, মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি হলো, মানুষ জীবন ও সৃষ্টির অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে। এ কারণে উসতায হাসান আল বান্না 'ফাহম' তথা অনুধাবনকে বাইয়াতের প্রথম রুকন হিসেবে স্থির করেছেন। আর তাকে ইখলাস, আমল, জিহাদ ও ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি দাওয়াতের মৌলিক রুকনগুলোর ওপর অগ্রগণ্য করেছেন। কারণ, 'ফাহম' তথা অনুধাবনের স্থান এসব কিছুর আগে। কেননা, মানুষ সত্যকে ভালো করে জানা ও বোঝার পরই সেই সত্যের জন্য একনিষ্ঠ হয়ে কাজ করে এবং জীবন বাজি রেখে জিহাদ করে।

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইলমকে ঈমান ও আনুগত্যের পূর্বে স্থান দিয়েছেন। কারণ, এ দুটি তো ইলমেরই ফলাফল বা শাখা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ..﴾

"যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে, তারা যেন জানতে পারে যে, এটা অবশ্যই তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে সত্য। অতঃপর তারা যেন এর প্রতি ঈমান আনে এবং তাদের অন্তর যেন এর অনুগত হয়।"
সূরা হাজ : ৫৪

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মৌলিক নীতিমালায় আন্দোলনের যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে, তার প্রথম লক্ষ্যটি হলো জ্ঞানগত লক্ষ্য। আর জ্ঞানগত লক্ষ্যের পদ্ধতি হলো– কুরআনুল কারিমের আহ্বানকে সুস্পষ্ট ও পরিপূর্ণরূপে ব্যাখ্যা করা। যে ব্যাখ্যা কুরআনের আহ্বানের প্রকৃতি ও সর্বজনীনতা ফুটিয়ে তুলবে এবং যুগের চাহিদার নিরিখে তার আবেদন উপস্থাপন করবে। সেইসাথে মিথ্যা প্রচার ও সংশয় দূরীভূত করবে।

দ্বিতীয় লক্ষ্যটি হলো কর্মগত লক্ষ্য। অর্থাৎ, কুরআনের নীতিমালার সাথে মানুষের অন্তর ও আত্মার সম্পর্ক স্থাপন করা এবং অন্তর্জগতে কুরআনের প্রভাবকে নবায়ন করা। আর কর্মগত লক্ষ্যের পদ্ধতি হলো– প্রকাশনা ও বিভিন্ন প্রচারমাধ্যমের দ্বারা কুরআনের দাওয়াতকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া, কুরআনের নীতিমালার আলোকে সংগঠনের সদস্যদের ব্যক্তিত্ব গঠন করা, প্রত্যেক ব্যক্তি ও পরিবারে দ্বীনের প্রায়োগিক অর্থ ব্যাখ্যা করে তার অনুশীলনে

www.bjilibrary.com

উদ্বুদ্ধ করা এবং তাদেরকে যোগ্য করে গড়ে তোলা। অর্থাৎ, শরীরচর্চার মাধ্যমে শারীরিকভাবে, ইবাদতের মাধ্যমে আত্মিকভাবে এবং জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে গড়ে তোলা।

এ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ইখওয়ানের শিক্ষানীতি প্রতিষ্ঠিত– যা বুদ্ধিবৃত্তিক গঠন ও সংস্কৃতি চর্চাকে তার পূর্ণাঙ্গ নীতিমালার প্রাথমিক অংশ হিসেবে স্থির করেছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের শিক্ষাব্যবস্থা এ মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যে, প্রত্যেক মুসলিমের বিবেক-বুদ্ধিকে এমনভাবে গঠন করতে হবে, যেন সে দ্বীনি জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারে। এ কারণে ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যের জন্য আবশ্যক হলো, ইসলামি শিক্ষা-সংস্কৃতির ন্যূনতম এতটুকু আয়ত্ত করা– যা দ্বারা সে তার আকিদা-বিশ্বাসকে উপলব্ধি, সঠিকভাবে ইবাদত পালন এবং জীবনাচারকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হবে। সেইসাথে আল্লাহপ্রদত্ত হালাল-হারামের সীমারেখা এবং আদেশ-নিষেধের সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। সে চিন্তা করবে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে। আর এসবের আলোকে নিত্যনতুন ঘটনাপ্রবাহ ও মানুষের মধ্যকার বিচার-ফয়সালার ক্ষেত্রে একজন মুসলিম হিসেবে সিদ্ধান্ত প্রদানে সক্ষম হবে।

যেমন তার জন্য জরুরি হলো, এ বিষয় উপলব্ধি করা যে, তার চারপাশের জীবন কীভাবে পরিচালিত, পরিবর্তিত ও প্রভাবান্বিত হচ্ছে? এবং সেই পরিচালনা, পরিবর্তন ও প্রভাব বিস্তারের কারণসমূহ কী কী?

ইখওয়ানের সদস্যকে অবশ্যই ওই ছোটো সমাজ সম্পর্কে জানতে হবে– যেখানে তার বসবাস, সেটা গ্রাম বা শহর যা-ই হোক। এরপর ধীরে ধীরে বিস্তৃত সমাজ তথা ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক অর্থে যে রাষ্ট্র বা দেশ রয়েছে, সে সম্পর্কে জানতে হবে। এরপর ক্রমান্বয়ে বৃহৎ দেশ, তথা উপসাগর থেকে মহাসাগর পর্যন্ত জানতে হবে। সবশেষে সর্ববৃহৎ দেশ– যা মূলত ইসলামি সাম্রাজ্যও বটে, তথা এক মহাসাগর থেকে অপর মহাসাগর পর্যন্ত জানতে হবে। অনুরূপ তাকে বিপরীত স্রোত ও বিরোধী শক্তি সম্পর্কেও সম্যক ধারণা রাখতে হবে। যেমন– ইহুদি, খ্রিষ্টান, শিয়া এবং মুসলিম বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে তাদের এজেন্ট তথা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী, অজ্ঞেয়বাদী, পশ্চিমাদের পদলেহী অন্ধ অনুসারী, ইসলামবিদ্বেষী চক্র ও স্বার্থান্বেষী মহল এবং অন্যান্য বস্তুবাদী ও পদলোভীদের তৎপরতা ও দুরভিসন্ধি বুঝতে হবে।

www.bjilibrary.com

এ বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যথাযথ প্রস্তুতির লক্ষ্যে ইখওয়ানের সাংস্কৃতিক শিক্ষানীতি প্রবর্তিত হয়েছে এবং তার জন্য 'পরিবার বিভাগ' (Family Section) প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে অন্যান্য বিভাগ এবং ইসলামি শিক্ষার বিভিন্ন শাস্ত্রে পারদর্শী ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের থেকেও সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন ইসলামকে তার প্রকৃত ও ব্যাপকতর রূপে অনুধাবন করেছে। ইসলামের এই রূপটি অনেক মানুষের কাছেই অস্পষ্ট; এমনকি খোদ অনেক মুসলিম সন্তানদের মধ্যেও। ইখওয়ানুল মুসলিমিন মনে করে– ইসলাম হলো দ্বীন ও সাম্রাজ্য, ইবাদত ও শাসন, আধ্যাত্মিকতা ও আমল, সালাত ও জিহাদ এবং কুরআন ও তরবারি– এসবের সমষ্টি। যেমন, এই আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বিশ মূলনীতির প্রথম নীতিতে বলেন–

الإسلام نظام شامل يتناول مظاهر الحياة جميعاً فهو دولة ووطن أو حكومة وأمة. وهو خلق وقوة أو رحمة وعدالة. وهو ثقافة وقانون أو علم وقضاء. وهو مادة وثروة أو كسب وغنى. وهو جهاد ودعوة أو جيش وفكرة. كما هو عقيدة صادقة وعبادة صحيحة سواء بسواء.

"ইসলাম এমন এক পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা– যা মানবজীবনের সকল দিক ও বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করে। অতএব, ইসলাম হচ্ছে রাষ্ট্র ও দেশ, শাসনব্যবস্থা ও জাতি, আখলাক ও শক্তি (Power), রহমত ও আদালত, সংস্কৃতি ও আইন, জ্ঞানবিজ্ঞান ও বিচারব্যবস্থা, পুঁজি ও সম্পদ, উপার্জন ও প্রাচুর্য, জিহাদ ও দাওয়াত, সেনাবাহিনী ও আদর্শ। ইসলাম যেমন বিশুদ্ধ বিশ্বাস, ঠিক তেমনি বিশুদ্ধ আমলও। উভয়টিই সমান গুরুত্বের দাবিদার।"

দ্বীনের ব্যাপারে পশ্চিমা খ্রিষ্টবাদের ধারণা হলো– 'দ্বীন হলো মানুষের সাথে প্রভুর ব্যক্তিগত সম্পর্কের একটি সেতুবন্ধন মাত্র। আর তার স্থান হলো কেবল মসজিদ, গির্জা ইত্যাদি উপাসনালয়। রাষ্ট্র ও সমাজের সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক নেই।'

বর্তমানে বহু মানুষের মনে এ চিন্তা প্রভাব বিস্তার করে আছে এবং এ ধারণাকে পুঁজি করে অনেকে আবার ইখওয়ানের দাওয়াতি কাজকে প্রশ্নবিদ্ধ করে যে– ইখওয়ান তো ধর্ম ও রাজনীতিকে গুলিয়ে ফেলেছে!

www.bjilibrary.com

অনেক মানুষের কাছে ইসলামের এই পূর্ণাঙ্গ ও ব্যাপকতর রূপটি অপরিচিত। এমনকি শহিদ হাসান আল বান্না তো ব্যাখ্যা করার সুবিধার্তে এর নাম দিয়েছেন– 'ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইসলাম' (إسلام الإخوان المسلمين)। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে– ইসলামের এই ব্যাপকতার ধারণা স্বয়ং ইসলামের অনুরূপ অতি প্রাচীন। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এবং তাদের নিষ্ঠাবান অনুসারীগণ ইসলামের ব্যাপারে এ ধারণাই পোষণ করতেন। এটিই কুরআন ও সুন্নাহ সমর্থিত ইসলাম।

ইসলামের ব্যাপকতার বিষয়ে অজ্ঞতা সৃষ্টির কারণ

এক. পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞানচর্চার অভাব

ইসলাম সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জ্ঞানের অভাবের কারণে মুসলিমদের মনে বিভিন্ন প্রকার সংশয়, কুসংস্কার ও মন্দ ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটে। তার সাথে যুক্ত হয়েছে সীমালঙ্ঘনকারীদের বিকৃতি, বাতিলপন্থিদের চৌর্যবৃত্তি ও অজ্ঞদের অপব্যাখ্যাও। এসবের কারণে ইসলামের সেই হৃদয়কাড়া সৌন্দর্য অজ্ঞতার পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে এবং এর অনুসারীদের মধ্যকার ঐক্যে ফাটল ধরে। সমাজে ইসলামের শিক্ষা ও বিধানাবলির ভারসাম্য বিনষ্ট হয়। গুরুত্বহীন বিষয়গুলোকে প্রাধান্য দিয়ে আগে নিয়ে আসা হয় এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোকে গুরুত্বহীন করে পেছনে ঠেলে দেওয়া হয়। ফলে তুচ্ছ বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো তুচ্ছ হয়ে যায়।

দুই. বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন ও সাংস্কৃতিক উপনিবেশনের প্রভাব

ভিনদেশি দখলদারদের শাসনামলে মুসলিম দেশগুলোতে বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসন বা সাংস্কৃতিক উপনিবেশ তুমুল প্রভাব বিস্তার করে– যা মুসলমানদের জনজীবনে আধুনিকতার মোড়কে নতুন ধ্যান-ধারণার জন্ম দেয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উপকরণের মাধ্যমে এগুলোকে মুসলমানদের মননে বদ্ধমূল করে দেওয়া হয়।

উপনিবেশের সবচেয়ে মারাত্মক ও ক্ষতিকর দিকটি ছিল– তারা মুসলিমদের সন্তানদের মধ্য হতে সৃষ্টি করে 'সুশীলসমাজ' নামে একটি দল। নিজেদের তত্ত্বাবধানে রেখে দুধ-কলা খাইয়ে যত্নের সাথে এই দলকে তারা লালনপালন করে। পশ্চিমা দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে তাদের বড়ো করে তোলে। তাদের অন্তর ও বিবেক-বুদ্ধিকে পশ্চিমা সভ্যতার প্রতি মুগ্ধতা দ্বারা পূর্ণ করে। তাদের হৃদয়ে

www.bjilibrary.com

সৃষ্টি করে পশ্চিমা আইনকানুনের প্রতি সম্মান ও রীতিনীতির প্রতি ভালোবাসা। পশ্চিমারা এদের নিজেদের দ্বীন-ধর্ম, সংস্কৃতি ও উত্তরাধিকার সম্পর্কে অতি অল্পই পরিচিত হতে দিয়েছে। যতটুকু সুযোগ দিয়েছে, তাতেও দ্বীনের বিকৃত রূপ উপস্থাপন করে, দ্বীনের বিভিন্ন বিষয়ে সাংঘর্ষিক রূপ দাঁড় করিয়ে তাদের মধ্যে হীনম্মন্যতা সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছে।

আশ্চর্যজনক হলেও সত্য যে, মুসলিমদেরই একটা শ্রেণি আজ নিজেদের দেশে বসবাস করছে ভিনদেশিদের মতো। তারা দেখতে মুসলিম ও স্থানীয় অধিবাসীদের মতো হলেও তাদের বিবেক-বুদ্ধি ইউরোপীয় বা আমেরিকান।

ইখওয়ানের বিকল্প শিক্ষানীতি

এমন পরিস্থিতিতে ইখওয়ানের জন্য একটি পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা জরুরি হয়ে পড়েছিল। প্রয়োজন হয়ে দাঁড়ায়– প্রাচীন অজ্ঞতা ও নব্য জাহালাতের মোকাবিলা করে ইখওয়ান তার প্রতিটি সদস্যের জন্য একটি পরিপূর্ণ শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে– যার উৎস হবে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি-মুক্ত ইসলামের নির্মল ও স্বচ্ছ ঝরনা। যেখানে থাকবে না কালাম শাস্ত্রবিদদের জটিল ও সূক্ষ্ম আলোচনা, সুফি-সাধকদের কৃত্রিমতা এবং ফকিহগণের নানা ধরনের জটিল প্রশ্নোত্তরের ম্যারপ্যাঁচ।

এ কারণে ইখওয়ানের কাছে কুরআন মাজিদ ও কুরআনের তাফসিরই হলো সংস্কৃতির প্রথম ও প্রধান উৎস। এক্ষেত্রে সালাফগণের (পূর্বসূরিদের) তাফসির অন্যদের তুলনায় অগ্রগণ্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে ইখওয়ান তাফসিরে ইবনে কাসিরকে সাদরে গ্রহণ করেছে আর এই তাফসিরগ্রন্থকেই ইখওয়ান তাদের প্রধান উৎসগ্রন্থ হিসেবে স্থির করেছে।

ইখওয়ানের দ্বিতীয় উৎস হলো সুন্নাহ। তবে এর বিশুদ্ধতা নিরূপণ ও ব্যাখ্যার জন্য ইখওয়ান হাদিসের নির্ভরযোগ্য ইমামগণের ব্যাখ্যার দ্বারস্থ হয়।

শহিদ ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর 'বিশ মূলনীতি'র দ্বিতীয় নীতিতে বলেন–

والقرآن الكريم والسنة المطهرة مرجع كل مسلم في تعرف أحكام الإسلام.
ويفهم القرآن طبقاً لقواعد اللغة العربية من غير تكلف ولا تعسف، ويرجع في
فهم السنة المطهرة إلى رجال الحديث الثقات.

www.bjilibrary.com

"ইসলামের বিধিবিধান জানার ক্ষেত্রে কুরআনুল কারিম ও পবিত্র সুন্নাহ হচ্ছে প্রত্যেক মুসলিমের প্রত্যাবর্তনস্থল। কুরআনুল কারিমকে আরবি ভাষার নিয়মাবলির আলোকে সকল প্রকার কৃত্রিমতা ও স্বেচ্ছাচারিতা থেকে মুক্ত হয়ে বুঝতে হবে। আর হাদিস বোঝার ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত হাদিস বর্ণনাকারীদের দ্বারস্থ হতে হবে।"

এ কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন উলুমুল কুরআন ও উলুমুল হাদিসের প্রতি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব প্রদান করে। আর হাদিসের কিতাবগুলো হতে *রিয়াদুস সালিহিন*-কে বিশেষভাবে পাঠ্য করেছে। এমনিভাবে ইখওয়ান জোর তাকিদ প্রদান করে ফিকহুল হাদিস ও ফিকহুস সুন্নাহর প্রতিও। ইসলামের প্রায়োগিক দৃষ্টান্ত ও পবিত্র কুরআনের আমলি ব্যাখ্যা হিসেবে তারা সিরাতে নববির পাঠ, তা অনুধাবন ও তার উপদেশাবলির প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করে।

ইখওয়ান ইসলামের ইতিহাস এবং ইসলামের বীরসেনানী মুসলিম সেনাপতি, আলিম-উলামা ও সংস্কারকগণের জীবনী পাঠের প্রতি মোটেও উদাসীন নয়।

ইখওয়ান তার শিক্ষানীতিতে দ্বীন, চিন্তা ও রাজনীতির ক্ষেত্রে উলটো স্রোত ও বিরোধী শক্তিগুলোর কথাও ভুলে যায়নি। ইখওয়ান তাদের সম্পর্কেও তুলনামূলক পাঠের ব্যবস্থা করেছে। যেমন– জায়নবাদ, সাম্যবাদ, উপনিবেশবাদ, মিশনারি সংস্থা ও সংগঠন এবং ফ্রিম্যাসনরি,[৫] বাহায়ি ও কাদিয়ানি মতবাদ ইত্যাদি।

ইখওয়ানের শাখা ও কার্যালয়গুলো পরিণত হয়েছিল জ্ঞানচর্চা ও ইসলামি জাগরণের ভরকেন্দ্র। আর তাদের ঘরগুলো ফিকির ও তারবিয়াতের নিয়মতান্ত্রিক হালকার রূপ ধারণ করেছিল। এ শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ আদর্শ জাতি গঠনে তার সুফলও প্রদান করেছে। যে কারণে এই শিক্ষাপ্রাপ্ত মিশরের তরুণদের চিন্তাচেতনা হয়ে ওঠে অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারমুক্ত। তাদের দৃষ্টির সামনে এখন বৃহৎ ইসলামি বিশ্বের ইস্যুগুলোই জ্বলজ্বল করে। তারা জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এখন ইসলামের বিস্তৃত অঙ্গনে

---

৫ ফ্রিম্যাসনরি (Freemasonry) একটি গুপ্ত সংঘ। ফ্রিম্যাসনদের দাবি অনুসারে বর্তমানেও এই সংঘে মিলিয়ন মিলিয়ন সদস্য রয়েছে, যারা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপে বিরাজমান আছে। তবে গবেষকদের অনেকের মতে, প্রকৃত ফ্রিম্যাসনরির স্থায়িত্বকাল ছিল রাজা সলোমনের মন্দির নির্মাণের সময়কাল থেকে মধ্যযুগে ১৬০০ শতাব্দী পর্যন্ত। ধারণা করা হয়– ফ্রিম্যাসনরা মূলত নাইটস টেম্পলারদের থেকে এসেছে। –অনুবাদক

www.bjilibrary.com

বিচরণ করতে শিখেছে। তারা ইসলামি সংস্কৃতির বিশাল ময়দানের সন্ধান পেয়েছে এবং আলোকোজ্জ্বল দৃষ্টি ও মুক্তমনে তার মৌলিক উৎসগুলোর অধ্যয়ন শুরু করেছে।

উল্লেখ্য, মুসতফা কামিল ও সাদ জগলুলের শাসনামল থেকে জাতি ও বর্ণপ্রথার প্রাধান্য ছিল। সামগ্রিকভাবে মিশরের অধিকাংশ জনগণের মধ্যে ছিল আবেগপ্রবণতা ও বাগ্মিতার বৈশিষ্ট্য। সে সময় মানুষের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন ছিল– তাদের অন্তরকে পুনর্জীবিত করা, অনুভূতিকে শাণিত করা, ইসলামি মতাদর্শের বিরোধী মতাদর্শগুলোকে রুখে দেওয়া; যেমন– কম্যুনিজম। সেইসাথে ইখওয়ানের প্রয়োজন ছিল– একদিকে দাওয়াত প্রচারে নিমগ্ন হওয়া এবং অপরদিকে তার বাস্তব প্রয়োগ ও দাবিপূরণে মনোনিবেশ করা। কিন্তু সূচনাকাল থেকেই ইখওয়ান নানামুখী সংকট ও সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ সকল বাধাবিপত্তির কারণে ইখওয়ানের অধিকাংশ কর্মীর কাঙ্ক্ষিতরূপে জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তি চর্চার সুযোগ হয়ে ওঠেনি। ফলে তাদের জ্ঞানের সমৃদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তিক শক্তি অর্জন করতে চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর লেগে যায়। ইতোমধ্যে শিশুরা যৌবনে এবং পরিণতরা প্রৌঢ়ত্বে উপনীত হয়। এর মধ্য দিয়েই বিকাশ ঘটে তাদের সুপ্ত প্রতিভার।

ইমাম হাসান আল বান্না জীবনের শেষদিকে এসে অনুভব করেন, একদিকে ইখওয়ানের সদস্যদের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক কাজের বিকাশ ঘটাতে হবে, সেইসাথে ইখওয়ানের সদস্য নয়– এমন মানুষদের মাঝেও ইসলামের জীবনাদর্শ এবং এর উদ্দেশ্যসমূহ তুলে ধরতে হবে। এই শূন্যতা পূরণ এবং উক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে ইমাম বান্না *আশ-শিহাব* নামক একটি মাসিক জার্নাল প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর প্রত্যাশা ছিল, এই জার্নাল *আল-মানার*-এর শূন্যতাও পূরণ করতে সক্ষম হবে, যেটি তার প্রতিষ্ঠাতা সাইয়িদ রশিদ রিদার ইন্তেকালের পর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এ জনপ্রিয় জার্নালটির মাত্র পাঁচটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। এই জার্নালের অধিকাংশ লেখা শহিদ হাসান আল বান্নাই প্রস্তুত করতেন। এরপর ১৯৪৮ সালের দুর্যোগ নেমে আসে এবং ১৯৪৯ সালে *আশ-শিহাব*-এর প্রতিষ্ঠাতা ইমাম বান্না গুপ্তহত্যার শিকার হন।

উন্নত চরিত্র গঠন

ইখওয়ানের তালিম-তারবিয়াতের অন্যতম লক্ষ্য হলো– আত্মিক পরিশুদ্ধি ও উন্নত চরিত্র গঠন। ইখওয়ান এ বিষয়ে জোর তাকিদ দেয়। এমনকি ইখওয়ান

www.bjilibrary.com

মনে করে– চারিত্রিক পরিশুদ্ধিই সমাজ পরিবর্তনের প্রথম চালিকাশক্তি। শহিদ ইমাম হাসান আল বান্না একে 'পরিবর্তনের লাঠি' (عصا التحويل) বলে অভিহিত করতেন। আর এ লাঠিকে ট্রাফিক পুলিশের দিক-নির্দেশক লাঠির সাথে তুলনা করতেন, যা সড়কে ট্রাম ও গাড়ির পথ পরিবর্তন করে। সেইসাথে তিনি এ প্রসঙ্গে কবির এ কথাটি বারংবার পুনরাবৃত্তি করতেন–

لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها** ولكن أخلاق الرجال تضيق

শপথ তোমার জীবনের!
সংকীর্ণ হয়নি কোনো শহর জনসংখ্যার কারণে;
সংকীর্ণ হয়েছে শহর মানুষের চরিত্রের কারণে।

ইমাম হাসান আল বান্না বিশ্বাসের সাথে এ কথাটি বারবার বলতেন, পৃথিবীর বুকে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের পূর্বে যে সংকটটি দেখা দেয় তা হলো– অন্তর ও মানসিকতার সংকট।

'আমরা মানুষকে কীসের দাওয়াত দেবো' (إلى أي شيء ندعو الناس) নামক পুস্তিকার একটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম হলো 'আমরা কোত্থেকে শুরু করব'। এ শিরোনামের অধীনে শহিদ হাসান আল বান্না বলেন–

"উম্মাহর পরিগঠন, জাতির তারবিয়াত, প্রত্যাশা বাস্তবায়ন এবং এর প্রাথমিক শর্তগুলো কার্যকর করতে হবে। যে জাতি এ জাতীয় পরিবর্তনের চেষ্টা করে অথবা যে দল এসবের প্রতি আহ্বান করে, তাদের প্রয়োজন বিশাল মনোবল ও শক্তি। নিম্নে বর্ণিত কয়েকটি গুণাবলির মধ্য দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটতে পারে–

এমন ইচ্ছাশক্তি, যেখানে কোনো দুর্বলতার ছাপ থাকবে না। পূর্ণ আমানতদারি, যেখানে খিয়ানত বা চরিত্র বদলের কোনো স্থান হবে না। এমন ত্যাগ-কুরবানি, কোনো লোভ-লালসা ও কৃপণতা যার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারবে না। নিজের উৎসের পরিচয় জানা, তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন এবং তার যথাযথ মূল্যায়ন; এক্ষেত্রে সে কোনো ভুল করবে না, এ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হবে না এবং প্রবঞ্চনার শিকার হবে না।

এ সকল মৌলিক গুণ এবং রুহের এ প্রবল শক্তির ওপর ভর করেই উম্মাহর ভিত রচিত হয়। এর মাধ্যমে নতুন জাতিসত্তার বিকাশ ঘটে, উন্নত সমাজ গড়ে ওঠে এবং যারা দীর্ঘকাল নির্জীব জীবন কাটিয়েছে, তারা সঞ্জীবনী শক্তি লাভ করে।

www.bjilibrary.com

যদি কোনো জাতির মধ্যে এ চারটি গুণের অনুপস্থিতি লক্ষ করা যায় অথবা কমপক্ষে তাদের নেতা ও সংস্কারবাদীদের মধ্যে এগুলো অনুপস্থিত থাকে, তাহলে ধরে নিতে হবে, সেই জাতি বড়োই নিঃস্ব এবং তাদের কাজকর্ম অন্তসারশূন্য। তারা কোনো সফলতা লাভ করতে পারবে না এবং প্রত্যাশার বাস্তবায়ন ঘটাতেও সক্ষম হবে না। বরং তারা স্বপ্ন, ধারণা ও কল্পনার জগতে বসবাস করছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴿٢٨﴾

"অথচ সত্যের ব্যাপারে এমন ধারণা মোটেই ফলপ্রসূ নয়।"
সূরা নাজম : ২৮

এটিই মহান আল্লাহর চিরন্তন নিয়ম এবং সৃষ্টির ব্যাপারে এটিই তার বিধান। আল্লাহর বিধানে আপনি কখনও কোনো পরিবর্তন পাবেন না–

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ... ﴿١١﴾

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" সূরা রাদ : ১১

এটি মূলত সেই নিয়ম, যা রাসূল সা. হাদিসে ব্যক্ত করেছেন–

يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ. وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ. وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ.

"অচিরেই বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী তোমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হবে, যেমন খাবারের পাত্রে আহার গ্রহণকারীরা সমবেত হয়। জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল, সেদিন কি আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এমন অবস্থা হবে?' নবিজি সা. বললেন– 'না; বরং সেদিন তোমাদের সংখ্যা হবে প্রচুর। কিন্তু তোমরা সেদিন স্রোতের আবর্জনার ন্যায় ভেসে যাবে। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর থেকে তোমাদের ব্যাপারে ভয় দূর করে দেবেন এবং তোমাদের অন্তরে দুর্বলতা সঞ্চার করবেন।'

www.bjilibrary.com

তখন এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলেন– 'হে আল্লাহর রাসূল, কী সেই দুর্বলতা?' নবিজি সা. বললেন– 'দুনিয়ার মহব্বত এবং মৃত্যুর প্রতি অনীহা'।" আবু দাউদ : ৪২৯৭

এ হাদিসে আমরা দেখতে পেলাম– রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, উম্মাহর দুর্বলতা ও জাতির লাঞ্ছনার কারণ হলো– আত্মার দুর্বলতা, অন্তরের নির্জীবতা, উত্তম চরিত্রের শূন্যতা এবং বীরত্ব ও সাহসিকতার অভাব। যদিও সেদিন সংখ্যা হবে প্রচুর এবং জাগতিক উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির পথে তারা এগিয়ে যাবে বহু দূর!"

ইমাম হাসান আল বান্নার পর ইখওয়ানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন দ্বিতীয় মুরশিদ উসতায হাসান হুদায়বি রহ.। তিনিও এ বিষয়ে ইমাম হাসান আল বান্নার মতোই সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর কিছু এমন যুগান্তকারী কথা রয়েছে, যেগুলো বহুল প্রচলিত এবং অনেকের মুখস্থ। তিনি বলেন–

أخرجوا الإنجليز من قلوبكم يخرجوا من بلادكم

"তোমরা নিজেদের অন্তর থেকে ইংরেজদের বের করে দাও, তাহলে তারা তোমাদের দেশ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হবে।"

তিনি আরও বলেন–

أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم

"তোমাদের অন্তরে ইসলামি রাষ্ট্র কায়েম করো, তাহলে তোমাদের দেশেও তা কায়েম হবে।"

তিনি এ জাতীয় বক্তব্যের মাধ্যমে মূলত ইংরেজ বিতাড়ন ও ইসলামি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা-সাধনা এবং রাজনৈতিক-সামরিক সংগ্রাম থেকে বিমুখ করতে চেয়েছেন এমন নয়। আর তা কী করেই-বা সম্ভব? অথচ উসতায হুদায়বির অনুসারী ও সেনারাই তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এবং সুয়েজ উপকূলীয় যুদ্ধে, 'তাল আল-কাবির'-এর যুদ্ধে তারা বীরদর্পে অংশগ্রহণ করেছে। বরং উসতায হুদায়বি এ কথার মাধ্যমে বোঝাতে চেয়েছেন– প্রত্যেক সংগ্রাম সফল হওয়ার মূলমন্ত্র হলো, অন্তরকে সে উদ্দেশ্যে প্রস্তুত করা, অন্তরে সেই চেতনা পূর্ণরূপে ধারণ করা এবং চরিত্রকে এমন সুন্দর করা, যা ব্যক্তির মধ্যে পরিবর্তন আনয়নের মধ্য দিয়ে পর্যায়ক্রমে সমাজকে বদলে দেবে। কুরআন মাজিদে সমাজ-পরিবর্তনের বাধা সম্পর্কে বলা হয়েছে–

www.bjilibrary.com

...إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ... ﴿١١﴾

"আল্লাহ কোনো জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত-না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে।" সূরা রাদ : ১১

ইসলাম উত্তম চরিত্রকে ঈমানের শাখা বা তার পরিপক্ব ফল হিসেবে গণ্য করে। বিশুদ্ধ ঈমানের জন্য যেমন ব্যক্তির আকিদা-বিশ্বাস সঠিক হওয়ার সাথে সাথে ইবাদতে ইখলাস থাকতে হয়, তেমনি চরিত্রও সুন্দর-সঠিক হতে হয়। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

"ওই ব্যক্তি পরিপূর্ণ ঈমানদার, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।" আবু দাউদ : ৪৬৮২

'চরিত্র' শব্দটি অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। এমনকি আল্লাহর রাসূল সা. 'চরিত্রের সংশোধন'-কে রাসূল হিসেবে তাঁর দায়িত্ব বলে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ

"নিশ্চয় আমাকে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা সাধনের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে।" মুসনাদে আহমাদ : ৮৯৫২

এমনকি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা রাসূল সা.-এর সুন্দরতম যে প্রশংসাটি করেছেন, তা হলো–

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

"নিশ্চয় আপনি মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত " সূরা কলম : ৪

একবার মা আয়িশা রা.-কে নবিজি সা.-এর আখলাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো। জবাবে তিনি বললেন– "রাসূল সা.-এর আখলাক হলো আল-কুরআন।" অর্থাৎ, তিনি এ কথা দ্বারা বুঝিয়েছেন, পবিত্র কুরআনে যে সকল মর্যাদাপূর্ণ কাজের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, যে সকল কাজের আদেশ করা হয়েছে এবং যে সকল ভালো কাজে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে, তার সবই রাসূলুল্লাহ সা.-এর চরিত্রে বিদ্যমান ছিল।

www.bjilibrary.com

উত্তম চরিত্র শুধু নম্রতা প্রদর্শন ও ভালো ব্যবহারের নাম নয়, যেমনটি অনেকের ধারণা; যদিও এটি মুসলিম চরিত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি বটে। কারণ, হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

"মানুষের সাথে সুন্দর আচরণ করো।" তিরমিযি : ১৯৮৭

অপর এক হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبَكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنُكُمْ أَخْلَاقًا، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ.

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্য হতে আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে কাছে থাকবে ওই সকল ব্যক্তি, যাদের আখলাক সবচেয়ে সুন্দর। যারা মানুষের সাথে বিনয়ী হয়, যারা মানুষকে ভালোবাসে এবং মানুষও তাদেরকে ভালোবাসে।" মাকারিমুল আখলাক লিত তাবারানি : ৬

অনুরূপ শুধু অনৈতিক যৌনতা ও মাদক বর্জনের নামও আখলাক নয়, যেমনটি অনেকের ধারণা; যদিও এ ব্যাপারে সর্বাগ্রে উৎসাহিত করেছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন–

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ... ﴿٣٠﴾

"হে নবি! আপনি মুমিনদের বলে দিন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থানের হেফাজত করে। এটি তাদের জন্য অধিক পবিত্রতার মাধ্যম।" সূরা নূর : ৩০

অপর এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

...اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ ...﴿٩٠﴾

"নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদি ও ভাগ্যনির্ণায়ক শরসমূহ ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কর্ম। অতএব, তোমরা এগুলো পরিহার করো।" সূরা মায়িদা : ৯০

www.bjilibrary.com

ইত্যাদি যাবতীয় বিষয় ইসলামের অন্তর্ভুক্ত বটে, কিন্তু ইসলামে চরিত্রের ধারণা ও বিস্তৃতি আরও ব্যাপক ও গভীর। এতে মানবজীবনের সকল প্রশংসনীয় দিক সন্নিবেশিত আছে– সংযম, সত্যবাদিতা, সুকর্ম, লেনদেনে আমানতদারি, বলিষ্ঠ রায়, শাসন-বিচারে সততা, সত্যের প্রতি অবিচলতা, কল্যাণমুখী দৃঢ় প্রত্যয়, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি যত্নবান হওয়া, আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া, পুণ্য ও তাকওয়ার কাজে একে অপরকে সহযোগিতা করা ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন তার সদস্যদের মাঝে এ সকল গুণাবলির বিকাশ সাধনে তৎপর। ইখওয়ান তার জনশক্তির মাঝে যে গুরুত্বপূর্ণ চারিত্রিক গুণাবলি বদ্ধমূল করার প্রতি বিশেষভাবে যত্নশীল, সেগুলোর কয়েকটি হলো :

এক. সবর

সবর করতে হতে পারে পথের দীর্ঘ দূরত্ব অথবা পথ কণ্টকাকীর্ণ ও বিপদসংকুল হওয়ার কারণে। অথবা সে পথে থাকতে পারে জালিমের আতঙ্ক। কিংবা হতে পারে– লোভের বশবর্তী হয়ে বহু মানুষের বিপথে যাত্রার কারণে। এসব ক্ষেত্রে সবর জরুরি। এ পথে মানুষের আপত্তি, বিদ্রূপ, প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি, কষ্ট প্রদান ও জোর-জবরদস্তি ইত্যাদি কোনো কিছুর পরওয়া করা যাবে না। বিশেষত জিহাদের সময় ময়দানে তো সবরই সবচেয়ে বড়ো অবলম্বন। হকের পথে চলতে গিয়ে তো দুঃখ-কষ্টের স্রোতে সাঁতার কাটতে হয়। এ কারণে মহান আল্লাহ তায়ালা একই আয়াতে 'সবরের উপদেশ প্রদান' এবং 'হকের পথে অবিচল থাকার উপদেশ প্রদান' বিষয় দুটিকে একত্র করেছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"তারা পরস্পরকে হকের উপদেশ দেয় এবং সবরের উপদেশ দেয়।"
সূরা আসর : ৩

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা লুকমান হাকিম কর্তৃক তাঁর পুত্রকে দেওয়া উপদেশের বিবরণ দিয়ে বলেন–

يٰبُنَيَّ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوْفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلٰى مَآ اَصَابَكَ ۭ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿١٧﴾

www.bjilibrary.com

"ও ছেলে! সালাত কায়েম করো, সৎকাজের আদেশ করো, অসৎকাজে নিষেধ করো এবং বিপদাপদে সবর করো। নিশ্চয় সবর করাটা দৃঢ় সংকল্পের কাজ।" সূরা লুকমান : ১৭

এ কারণে আমরা দেখি, তাগুতের হুমকি-ধমকির সামনে নিরীহ মুসলিমগণ আল্লাহর দরবারে এ দুআ করেছেন–

...رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّتَوَفَّنَا مُسْلِمِيْنَ ﴿١٢٦﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য দিন এবং আমাদের মৃত্যু দান করুন মুসলিম হিসেবে।" সূরা আরাফ : ১২৬

রণাঙ্গনে যোদ্ধাগণ দুআ করেছেন এভাবে–

...رَبَّنَآ اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَّثَبِّتْ اَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكٰفِرِيْنَ ﴿٢٥٠﴾

"হে আমাদের রব! আমাদের ধৈর্য দান করুন, আমাদেরকে দৃঢ়পদ করুন এবং কাফির জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন।" সূরা বাকারা : ২৫০

দুই. অবিচলতা

সবরের সহযোগী ও পরিপূরকতা হলো– অবিচলতা। উসতায হাসান আল বান্না এটিকে বাইয়াতের দশটি রুকনের একটি হিসেবে স্থির করেছেন এবং এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন–

"অবিচলতা বলতে আমি বোঝাচ্ছি– ইখওয়ানের সদস্যরা দ্বীনের পথে কর্মোদ্যমী ও সংগ্রামী হবে এবং এ সংগ্রামের মেয়াদ যত দীর্ঘই হোক, যত বছর-কালই অতিক্রান্ত হোক, সে নিজ অবস্থার ওপর অটল থাকবে; যতক্ষণ-না আল্লাহ তায়ালার সাথে মিলিত হয়। এভাবে সে দুটি কল্যাণের একটি অবশ্যই লাভ করবে। হয়তো তার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হবে অথবা সে দ্বীনের পথে শাহাদাতবরণ করবে। এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে আল্লাহপাক বলেছেন–

مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى نَحْبَهٗ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ ۖ وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا ﴿٢٣﴾

www.bjilibrary.com

"মুমিনদের মধ্য হতে কিছু লোক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ শাহাদাতবরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষায় আছে। তারা নিজেদের ওয়াদায় কোনো রদবদল করেনি।" সূরা আহযাব : ২৩

সময় আমাদের কাছে চিকিৎসার একটি অংশ। কেননা, পথ অনেক দীর্ঘ, গন্তব্য বহু দূর এবং রাস্তাও বিপদসংকুল। এমতাবস্থায় সময় এমন এক বাহন– যা বিশাল সওয়াব ও উত্তম প্রতিদানের সাথে ব্যক্তিকে গন্তব্যে পৌঁছে দিতে সক্ষম।"

আমাদের এ দাওয়াতের সাথে সম্পৃক্তদের একটি বড়ো সংকট হলো– হীনম্মন্য ও সংকীর্ণমনা হওয়া। ফলে হিম্মতহারা লোকেরা এই পথে অবিচল থাকতে পারে না। যাত্রা শুরু করার পর, যখন তারা দেখে– গন্তব্য বহু দূর, যাত্রা অনেক কঠিন এবং পথ অনেক দীর্ঘ, তখন কেউ কেউ মাঝপথ থেকে সরে দাঁড়ায় অথবা পেছনে ফিরে যায় কিংবা ডানে-বামে ছিটকে পড়ে! এ কারণে এ পথের পথিকদের জন্য 'অবিচলতা'র গুণের প্রতি গুরুত্বারোপ করাটা ছিল অত্যন্ত জরুরি, যেন তারা চলতি পথে থমকে না দাঁড়ায় বা পেছনে সরে না পড়ে। এই দুর্বলতার একটি বিশেষ কারণ হলো– মানুষের মন নগদ পেতে ভালোবাসে। কারণ, মানুষকে ত্বরাপ্রবণ করেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এ কারণে মহান আল্লাহ তাঁর রাসূলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন–

﴿فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَّهُمْ...﴾

"আপনি সবর করুন, যেভাবে সবর করেছিলেন উলুল আযম (দৃঢ়প্রতিজ্ঞ) রাসূলগণ। আর তাদের (বিরোধীদের) বিষয়ে তাড়াহুড়ো করবেন না।" সূরা আহকাফ : ৩৫

আরেকটি সমস্যা হলো– দুর্বলচিত্তের মানুষ ততক্ষণ রাস্তায় টিকে থাকে, যতক্ষণ বাতাস বয় অনুকূলে, আকাশ থাকে মেঘমুক্ত এবং আবহাওয়া থাকে স্বচ্ছ। কিন্তু যখনই চারদিকে অন্ধকার নেমে আসে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়, সজোরে বাতাস প্রবাহিত হয়, তখন তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়ে এবং তারা থমকে যায়। এই শ্রেণির লোকদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿...فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ...﴾

"যখন তারা আল্লাহর পথে নিপীড়িত হয়, তখন মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর আযাবের মতো মনে করে।" সূরা আনকাবুত : ১০

www.bjilibrary.com

অথবা তাদের পরিণতি হয় ওই ব্যক্তির মতো, যার অবস্থা হলো–

...وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ...﴿١١﴾

"আর যদি সে কোনো পরীক্ষায় পড়ে, তবে পূর্বাবস্থায় (জাহেলিয়াত) ফিরে যায়। সে জাগতিক জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত, আখিরাতেও ক্ষতিগ্রস্ত। সূরা হাজ : ১১

এই অবস্থা অনেকটা ওই ব্যক্তির অবস্থার মতো, যে দ্বিধাদ্বন্দ্বের সাথে আল্লাহর ইবাদত করে। কিন্তু এদের ভিড়ে কিছু মানুষ এমনও আছে, যারা বিপদাপদে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে, কঠিন পরিস্থিতিতেও অবিচল থাকে, কিন্তু দুনিয়ার প্রলুব্ধকারী ভোগ্যসামগ্রীর সামনে দুর্বল হয়ে পড়ে। যখন তার সামনে অর্থসম্পদ হাতছানি দেয়, তখন তার মুখ থেকে লালা গড়িয়ে পড়ে। তখন সে নিজের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে এবং তার মিশন ও লক্ষ্যের কথা ভুলে যায়।

দাওয়াতের প্রত্যেক কর্মীর জন্য রাসূলে কারিম সা.-এর মাঝেই রয়েছে উত্তম আদর্শ। মক্কার মুশরিকরা নবিজি সা.-এর কাছেও অর্থসম্পদ ও পদপদবির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল, যেন এর বিনিময়ে তিনি আপন দাওয়াতের মিশন থেকে সরে আসেন। তখন রাসূল সা. স্বীয় চাচা আবু তালিবের সামনে সেই ঐতিহাসিক বাণীটি উচ্চারণ করেন–

وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللَّهُ، أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ.

"আল্লাহর শপথ! তারা যদি আমার ডান হাতে সূর্য এবং বাম হাতে চন্দ্র এনে দেয়, বিনিময়ে এই শর্ত প্রদান করে যে, আমি এ মিশন পরিত্যাগ করব, তাহলে আমি তা কক্ষনো করব না; যতক্ষণ-না আল্লাহ এ দ্বীনকে বিজয়ী করেন অথবা আমি এ দ্বীনের তরে জীবন উৎসর্গ করি!" আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : খ. ৩, পৃ. ৬৩

তিন. আশাবাদী হওয়া

আশাবাদী হওয়ার অর্থ হলো– অন্তরে ইসলামের বিজয়ের আশা পোষণ করা। এ বিশ্বাস রাখা যে, ভবিষ্যৎ ইসলামের পক্ষেই হবে এবং আল্লাহর সাহায্য সন্নিকটে। যদিও বর্তমানে চতুর্দিক থেকে সংকট ঘনীভূত হচ্ছে এবং

www.bjilibrary.com

বিপদাপদের কালো মেঘ আকাশ ছেয়ে ফেলছে, তারপরও আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের ব্যাপারে এ পথের পথিক কখনও হতাশ হয় না; বরং সব সময়ই আল্লাহর সাহায্য ও রহমতের প্রত্যাশী হয়ে থাকে।

শহিদ হাসান আল বান্না এ বিষয়ে জোর তাকিদ করতেন এবং বিভিন্ন কৌশলে তা বোঝানোর চেষ্টা করতেন। এর মাধ্যমে ইমাম বান্না মূলত উপনিবেশ ও অজ্ঞতার কারণে মানুষের মনের মধ্যে যে হন্তারক হতাশা ও ধ্বংসাত্মক নিরাশা বিরাজ করত, তিনি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতেন। ইমাম বান্না স্মরণ করিয়ে দিতেন– হতাশা হলো কুফরির নিদর্শন এবং নিরাশা হলো গোমরাহির কুফল। কারণ, আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

...إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

"নিশ্চয় আল্লাহর রহমত থেকে কাফির সম্প্রদায় ছাড়া আর কেউ নিরাশ হয় না।" সূরা ইউসুফ : ৮৭

...وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿٥٦﴾

"রবের রহমত থেকে পথভ্রষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আর কে নিরাশ হয়?" সূরা হিজর : ৫৬

ইমাম হাসান আল বান্নার একটি স্মরণীয় বাণী হলো–

"আজ যা বাস্তব, গতকাল তা স্বপ্ন ছিল। আর আজকের স্বপ্ন আগামীকাল বাস্তবে রূপ নেবে।"

ইমাম বান্না বলতেন–

"ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য ও বৃহৎ পরিকল্পনা হলো– মিশরকে স্বাধীন করে আরব বিশ্বকে উপনিবেশমুক্ত করা। অতঃপর মুসলিম বিশ্বকে আগ্রাসনমুক্ত করে সবাইকে পরম কাঙ্ক্ষিত খিলাফতের পতাকাতলে সমবেত করা। এরপর সমগ্র বিশ্বকে সঠিক পথনির্দেশ করা।"

আর এই পথ পাড়ি দিতে গিয়ে যে বিপদ ও ভয়ানক বাধাবিঘ্ন আসবে– তা আলোচনা করতেও উসতায বান্না ভুলতেন না। তিনি এ সকল বাধাবিপত্তির আলোচনার পাশাপাশি সফলতার পথ ও পন্থা আলোচনা করাকে জরুরি মনে করতেন এবং আশার প্রদীপকে উজ্জ্বল করে তুলতেন ।

www.bjilibrary.com

ইমাম হাসান আল বান্না বলতেন–

> "আমরা আহ্বান করি আল্লাহর দিকে– যা সর্বোৎকৃষ্ট আহ্বান। আমরা ইসলামি চিন্তার কথা বলি– যা সবচেয়ে দৃঢ়তর চিন্তা। মানুষের জন্য আমরা কুরআনের বিধান বাস্তবায়নের কথা বলি– যা সবচেয়ে যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনবিধান।"

সমগ্র বিশ্ব আজ সেই দাওয়াত ও তার প্রস্তুতিপর্ব এবং সেই আয়োজনের প্রতি মুখিয়ে আছে– যা কুরআনের আইন প্রতিষ্ঠার পথকে সুগম করবে। আল্লাহর শোকর যে, ইসলামি আন্দোলন কারও ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য কাজ করছে না। এই মহান আন্দোলনের কার্যক্রম ব্যক্তিস্বার্থ থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। এর লক্ষ্য কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি। এই আন্দোলন আল্লাহর সাহায্য ও তাঁর নুসরাতের আশাবাদী। কেননা, আল্লাহ তায়ালা যার সাহায্যকারী হবেন, তাকে কেউ পরাজিত করতে পারবে না। আল্লাহ বলেন–

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ مَوْلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاَنَّ الْكٰفِرِيْنَ لَا مَوْلٰى لَهُمْ ﴿١١﴾

> "আর তা এজন্য যে, আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক এবং কাফিরদের কোনো অভিভাবক নেই।" সূরা মুহাম্মাদ : ১১

কাজেই আমাদের সফলতার রহস্য হলো আমাদের দাওয়াতের শক্তি– বর্তমান পৃথিবী যার মুখাপেক্ষী হয়ে আছে। আমাদের উদ্দেশ্য মহৎ এবং আমাদের ওপর আছে আল্লাহর সাহায্য ও নুসরাত। আর আল্লাহর নুসরত ও সিদ্ধান্তের সামনে কোনো বাধা টিকে থাকতে পারে না, কোনো প্রতিবন্ধকতা তার পথ রোধ করতে পারে না–

...وَاللّٰهُ غَالِبٌ عَلٰٓى اَمْرِهٖ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿٢١﴾

> "আল্লাহ তায়ালা স্বীয় সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে প্রবল পরাক্রম; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" সূরা ইউসুফ : ২১

ইমাম আল বান্না 'হে যুবক' (إلى الشباب) পুস্তিকায় ব্যক্তি, সমাজ, অঞ্চল ও বিশ্বব্যাপী এই দাওয়াতের বৃহৎ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ আলোচনার পর বলেন–

> "হে যুবসমাজ! তোমরা তোমাদের সেসব মহান পূর্ববর্তীদের চেয়ে দুর্বল নও, যাদের হাতে আল্লাহ এ পথের সূচনা করেছেন। কাজেই মনোবল না হারিয়ে মনকে করো মজবুত এবং আল্লাহ তায়ালার এ বাণীকে তোমাদের দৃষ্টির সামনে রাখো–

www.bjilibrary.com

اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا ۖ وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ﴿١٧٣﴾

"যাদেরকে লোকেরা বলেছিল, তোমাদের বিরুদ্ধে তো মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছে, কাজেই তোমরা তাদের ভয় করো। কিন্তু এ কথায় তাদের ঈমান আরও দৃঢ়তর হয় এবং তারা বলে– আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি কতই-না উত্তম কর্মবিধাতা।" সূরা আলে ইমরান : ১৭৩

আমরা নিজেদের গড়ব, যেন আমাদের থেকে মুসলিম প্রজন্মের আবির্ভাব হয়। আমরা আমাদের ঘরগুলোকে গড়ব, যেন সেগুলো মুসলিমের ঘর হয়। আমরা আমাদের সমাজকে গড়ব, যেন তা মুসলিম সমাজে রূপান্তরিত হয় এবং এ সমাজ থেকেই মুসলিম শাসনের গোড়াপত্তন হয়।

আমরা আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত দৃঢ় পদে অবিচলতার সাথে চলতে থাকব এবং আল্লাহর রহমত ও সাহায্যে আমরা গন্তব্যে পৌঁছে যাব, ইনশাআল্লাহ। আর আল্লাহ তায়ালার সিদ্ধান্ত হচ্ছে–

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِـُٔوْا نُوْرَ اللّٰهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللّٰهُ اِلَّاۤ اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَهٗ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿٣٢﴾

"আল্লাহ অবশ্যই তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেন; যদিও কাফিররা তা অপ্রীতিকর মনে করে।" সূরা তাওবা : ৩২

আমরা সেই নূরের পূর্ণতা বিধানের জন্য প্রস্তুত করতে চাই এমন অবিচল ঈমান, যা শত বিপদের মাঝেও টলে না; এমন আমল, যা শত বাধার মধ্যেও থেমে যায় না; আল্লাহর প্রতি এমন তাওয়াক্কুল, যা দুর্বল হয়ে যায় না এবং এমন রুহ, যার কাছে সবচেয়ে সৌভাগ্যের দিন হলো সেদিন, যেদিন সে দ্বীনের পথে শাহাদাতবরণ করে আল্লাহর সাথে মিলিত হবে।"

এমন বেগবান প্রাণপ্রাচুর্যের মাধ্যমে ইমাম হাসান আল বান্না আস্থার বীজ বপন করতেন, মানুষের মাঝে আশা জাগাতেন এবং ওই সকল লোকের মনেও ইসলামের বিজয়ের আকাঙ্ক্ষাকে পুনর্জীবিত করতেন, যাদের উদ্যমকে দীর্ঘকালের হতাশা ও নিরাশা মৃতপ্রায় করে দিয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইমাম হাসান আল বান্না 'ইসলামের বিজয় অনিবার্য' শীর্ষক আলোচনাকে জোরালো করতে গিয়ে বিভিন্ন দলিল পেশ করতেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো :

বুদ্ধিবৃত্তিক দলিল

এ বিষয়ক বহু আয়াত ও হাদিস রয়েছে, যেখানে ইসলাম ও দ্বীনের জন্য নিশ্চিত সাহায্যের কথা বিবৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.

"যেন তিনি এ দ্বীনকে অপরাপর সকল দ্বীনের ওপর বিজয়ী করেন।"
সূরা তাওবা : ৩৩; সূরা ফাতহ : ২৮; সূরা সফ : ৯

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَيَأْبَى اللهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ...﴿٣٢﴾

"আল্লাহ তাঁর নূরের পূর্ণতা বিধান করবেনই।" সূরা তাওবা : ৩২

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الْأَمْرُ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ...

"এ দ্বীন ওই পর্যন্ত পৌঁছে যাবে, যেখানে দিন-রাত্রির আগমন হয়।"
মুসনাদে আহমাদ : ১৬৯৫৮

ঐতিহাসিক দলিল

এ দ্বীন ওই সময় সবচেয়ে শক্তিশালী রূপ ধারণ করে এবং দ্বীনের মধ্যে মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রবেশ করে, যখন তার অনুসারীদের বিপদাপদ চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। ইতিহাস এর সাক্ষী। যেমন– মুরতাদদের যুদ্ধ, ক্রুসেডসমূহ, তাতারিদের যুদ্ধ। এমনকি ইতিহাস এমনও ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে যে, বিজয়ী তাতারিরা স্বেচ্ছায় পরাজিতদের দ্বীনে প্রবেশ করেছে।

নেতৃত্বের উত্থান-পতন সূত্রের দলিল

একসময় সভ্যতার নেতৃত্ব ছিল কেবল প্রাচ্যকেন্দ্রিক ফারাও, হিন্দু, চৈনিক ও পারসিকদের হাতে। অতঃপর গ্রিক ও রোমানদের হাত ধরে এর নেতৃত্ব পশ্চিমা বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়। এরপর ইসলামি সভ্যতার সুবাদে সেই নেতৃত্ব

www.bjilibrary.com

আবার প্রাচ্যে প্রত্যানীত হয়। পরবর্তীকালে সেই নেতৃত্ব আবার আধুনিক পশ্চিমা বিশ্বে স্থানান্তরিত হয়, যেমনটি আমরা বর্তমানে দেখছি। তবে আমরা আশাবাদী যে, পশ্চিমা বিশ্ব মানবিক ও আত্মিকভাবে যে দীনতার শিকারে পরিণত হয়েছে এবং আত্মকলহ, অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, সামাজিক সংঘাত তাদের মধ্যে প্রতিনিয়ত যে বিনাশ সাধন করছে, ইনশাআল্লাহ অচিরেই নেতৃত্ব পুনরায় প্রাচ্যে ফিরে আসবে।

চার. ব্যয়ের মানসিকতা

ইখওয়ানকে যে চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তোলা হয়েছে, তন্মধ্যে ব্যয়ের মানসিকতা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এটিকে 'ত্যাগ-কুরবানি' বলেও ব্যক্ত করা যায়। এর দ্বারা লক্ষ্য হলো– ইখওয়ানের কোনো সদস্য দাওয়াতের কাজে শ্রম, সম্পদ ও সময় ব্যয়ে কোনো কার্পণ্য করবে না। দাওয়াতের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে, দ্বীনপ্রচারকদের সাহায্য-সহযোগিতা করতে এবং তাদের সন্তানসন্ততির দেখাশোনা ও সহায়তা করতে কোনো প্রকার ত্রুটি করবে না। নিজেদের জীবন ও সম্পদ –হোক তা অতি সাধারণ অথবা অত্যন্ত মূল্যবান– নিয়ে দাওয়াত ও দাঈদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ইখওয়ানের সদস্যদের কাঙ্ক্ষিত নিদর্শন হলো– 'তুমি দান করো, যাতে অন্যরা এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে; তুমি চাষাবাদ করো, যাতে অন্যরা তার ফসল ভোগ করতে পারে; তুমি পরিশ্রম করো, যাতে অন্যরা এর দ্বারা একটু প্রশান্তি পেতে পারে।'

এ মৌলিক চরিত্র-গুণের সুবাদে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অধিকাংশ সদস্য দরিদ্র ও বিভিন্ন দুরবস্থার শিকার হওয়া সত্ত্বেও দাওয়াতের প্রয়োজনে তারা সকল ব্যয় নির্বাহ করতে সমর্থ হয়েছে। তারা সক্ষম হয়েছে তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আবশ্যিক প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে। এমনকি তাদের মধ্য হতে এক ব্যক্তি নিজের সাইকেলটি পর্যন্ত বিক্রি করে দিয়েছে, যাতে তার মূল্য দিয়ে ইসমাইলিয়ায় ইখওয়ানের মারকাজ ও মসজিদ নির্মাণের কাজে অংশগ্রহণ করতে পারে। এরপর সে প্রতিরাতে ছয় মাইল পায়ে হেঁটে ইখওয়ানের কার্যালয়ে আসত এবং অনুরূপ রাস্তা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরত।

বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, সেই ব্যক্তি তার এ ত্যাগের কথা কারও সাথে কখনও আলোচনাও করেনি। একাধিকবার নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে তার দেরিতে আগমনের বিষয়টি ইমাম হাসান আল বান্না লক্ষ করেন। ফলে তার খোঁজখবর নিতে গিয়ে বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়ে; নাহয় তার এই কুরবানির কথা গোপনই

www.bjilibrary.com

থেকে যেত। প্রকৃত কারণ সামনে আসার পর ইখওয়ানের সদস্যরা তার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে চিন্তা করে। তার পবিত্র ত্যাগের স্বীকৃতি ও মহৎ অনুভূতির সম্মানার্থে তারা একটি নতুন সাইকেল ক্রয় করে তাকে উপহার দেয়। সেই ভাইয়ের নাম হলো আল-আওসাতি আলী আবুল আ'লা। ইমাম বান্না তাঁর مذكرات الدعوة والداعية 'মুযাক্কিরাতুদ দাওয়াহ ওয়াদ দাঈয়াহ' গ্রন্থে এ ঘটনার উল্লেখ করেছেন। এরকম আরও কত শত ঘটনা ব্যক্তির ইখলাসের আড়ালে ঢাকা পড়ে আছে, তার খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না!

শারীরিক সক্ষমতা অর্জন

ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের প্রশিক্ষণে শারীরিক সক্ষমতা অর্জনের বিষয়ে কখনও উদাসীন হয়নি। কেননা, মানুষের লক্ষ্যে পৌঁছা এবং জাগতিক ও পারলৌকিক দায়িত্বসমূহ আঞ্জাম দেওয়ার ক্ষেত্রে শারীরিক সক্ষমতা হচ্ছে অন্যতম সহযোগী। এ কারণে সহিহ হাদিসে বর্ণিত হয়েছে–

إن لبدنك عليك حقا.

"নিশ্চয় তোমার প্রতি তোমার দেহের হক রয়েছে।"

ইখওয়ানের শরীরচর্চার লক্ষ্য

সুস্বাস্থ্য ও সুঠাম দেহ

অন্তর ও বিবেক-বুদ্ধির ওপর সুস্বাস্থ্যের বড়ো প্রভাব রয়েছে। এ কারণে বলা হয়– সুস্থ দেহ, সুন্দর মন। অসুস্থ দেহ দায়িত্ব পালনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ কারণে পরিচ্ছন্নতা, রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা, মন্দ অভ্যাস পরিহার প্রভৃতির প্রতি ইখওয়ানে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেমন– দীর্ঘ রাত্রিজাগরণ, ধূমপান ইত্যাদি বদঅভ্যাস বর্জনে তাকিদ দেয় ইখওয়ান। এমনকি ইখওয়ানের সদস্যদের প্রতি আবশ্যিক নির্দেশ ছিল– তারা চা ও কফি যথাসম্ভব কম পান করবে এবং ধূমপান অবশ্যই পরিহার করে চলবে।

দৈহিক শক্তি ও কর্মতৎপরতা

শুধু সুস্থতাই যথেষ্ট নয়; বরং তার পাশাপাশি দেহকে শক্তিশালী ও মজবুত হতে হবে এবং কাজে-কর্মে হতে হবে তৎপর। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

www.bjilibrary.com

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ.

"আল্লাহর কাছে দুর্বল মুমিনের চেয়ে শক্তিশালী মুমিন উত্তম ও প্রিয়।" সহিহ মুসলিম : ২৬৬৪

এ কারণে শরীরচর্চা, দৈহিক পরিশ্রমসাধ্য খেলাধুলা যেমন– দৌড়, সাঁতার, তিরন্দাজি ইত্যাদির প্রতি ইসলামে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। হাদিসে এসেছে–

علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب الخيل.

"তোমাদের সন্তানদের সাঁতার, তিরন্দাজি ও ঘোড়ায় আরোহণ করতে শেখাও।"

কষ্টসহিষ্ণুতা

শুধু সুস্থতা ও দৈহিক শক্তিই যথেষ্ট নয়, যদি কষ্টসহিষ্ণুতা এবং কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেওয়ার অভ্যাস না থাকে। তাই ঠান্ডা, গরম, নিম্নভূমি, উচ্চভূমি, লোকালয় ও নির্জন ভূমিতে বসবাস ইত্যাদি সব পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে। প্রবাদ আছে–

اخشوشنوا، فإن النعمة لا تدوم.

"তোমরা নিজেদের কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় অভ্যস্ত করো। কেননা, নিয়ামত চিরস্থায়ী হয় না।"

এসব কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন শরীরচর্চাকেন্দ্র, স্কাউট দল প্রতিষ্ঠা এবং সেনাছাউনি প্রস্তুতকরণের প্রতি গুরুত্বারোপ করে। কষ্ট-ক্লেশ ও কঠিন পরিস্থিতি মোকাবিলায় নিজেদের অভ্যস্ত করে তুলতে তারা বিভিন্ন সময় পাহাড় ও মরুভূমিতে সফর করে। এভাবে তপ্ত রোদে, কনকনে শীতে, বৃষ্টির মাঝে মানিয়ে নিতে চেষ্টা করে ইখওয়ানরা। খাবার পানির স্বল্পতায়, নিম্নমানের খাবার ও পোশাকে নিজেদের খাপ খাইয়ে নেওয়ার চেষ্টাও করে। তবে ইখওয়ানের প্রশিক্ষকগণ এখানেই ক্ষান্ত হননি; বরং কখনও কখনও তারা ডাল ও শিমের মধ্যে ইচ্ছা করেই পাথরনুড়ি বা কঙ্কর রেখে দিতেন, যেন ইখওয়ানের কর্মীরা এ কষ্ট-ক্লেশে অভ্যস্ত হয়ে উদ্ভূত যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবিলায় সক্ষমতা অর্জন করতে পারে।

www.bjilibrary.com

কোনো সন্দেহ নেই যে, এই প্রশিক্ষণকে অনেক সময় নির্দয়তা মনে হলেও বাস্তবে জিহাদের ময়দানে তা ফলপ্রসূ প্রমাণিত হয়েছে– যখন সত্যি সত্যিই জিহাদের আহ্বান এসেছে এবং যুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে। কারণ, প্রাচুর্য ও ভোগবিলাসে মত্তরা অস্ত্র ধারণ ও যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার সক্ষমতা রাখে না। এর জন্য প্রয়োজন সুদৃঢ় মনোবল ও কঠিন ধৈর্য।

জেলখানা ও বন্দিশালার জীবনেও ইখওয়ানের প্রশিক্ষকদের এ প্রশিক্ষণ উপকারী প্রমাণিত হয়েছে। কারণ, জেলখানায় যে খাবার দেওয়া হতো, তাও ছিল শাস্তির একটি অংশ। সেখানে ঘুমের জন্য ছিল নিছক কাষ্ঠখণ্ড ও চাটাইয়ের ব্যবস্থা; অনেক ক্ষেত্রে কংক্রিটের মেঝেই ছিল আসল বিছানা। বন্দিদের যেকোনো উপায়ে কষ্ট দেওয়াই ছিল সেখানকার রীতি।

জিহাদের তারবিয়াত

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, জিহাদের তারবিয়াত। আমি বলছি না যে সামরিক প্রশিক্ষণ। কারণ, 'জিহাদ' সামরিক তৎপরতা থেকেও আরও ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। সামরিক তৎপরতা বলা হয়– যেখানে নিয়মতান্ত্রিক অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। কিন্তু জিহাদের মধ্যে অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণের পাশাপাশি ঈমান ও আখলাক চর্চা এবং আধ্যাত্মিকতা ও ত্যাগের বিষয়টিও অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ইখওয়ানের এ সকল কার্যক্রমের পূর্বে 'জিহাদ'-এর প্রকৃত অর্থ যেন ইসলামি শিক্ষা ও মুসলিম জীবনাচার থেকে একরকম উধাও হয়ে গিয়েছিল। সুফি ও অন্যান্য ধর্মীয় দলগুলো জিহাদের ব্যাপারে ছিল একেবারেই উদাসীন। এদিকে জাতীয়তাবাদী দলগুলো কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি গুরুত্ব দিত। ওয়ায়েজ ও পিরগণও মসজিদ ও খানকার কার্যক্রমের মাঝেই নিজেদের ব্যস্ত রাখতেন এবং জিহাদকে তাদের দায়িত্বের সীমানাবহির্ভূত মনে করতেন।

কিন্তু ইখওয়ানের সামগ্রিক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জিহাদের অর্থটি পুনরুজ্জীবিত হয় এবং তা সকলের সামনে স্পষ্ট হয়ে যায়। ইখওয়ান তার বই-পুস্তক, জার্নাল-পত্রিকা, সভা-সমাবেশ, কবিতা-গান ইত্যাদি সব মাধ্যমে জিহাদের চর্চা শুরু করে। এমনকি ইমাম হাসান আল বান্না এটিকে তাঁর বাইয়াতের দশটি রুকনের অন্যতম একটি রুকন হিসেবে স্থির করেন। ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অন্যতম একটি স্লোগান হচ্ছে–

www.bjilibrary.com

الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أسمى أمانينا.

"জিহাদ আমাদের পথ। আল্লাহর পথে মৃত্যু আমাদের আকাঙ্ক্ষা।"

জিহাদের স্মরণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিশেষ যে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা হলো, জিহাদসংশ্লিষ্ট ইসলামি দিবসসমূহ উদ্‌যাপন করা। যেমন– বদর দিবস, মক্কা বিজয় দিবস ইত্যাদি।

এ বিষয়ে আরেকটি পদক্ষেপ হলো, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পরিবারগুলোতে নবিজি সা.-এর সিরাতের এক বা একাধিক কিতাব পাঠ ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা। কেননা, সিরাত তো আল্লাহর পথে অবিরত জিহাদেরই প্রতিচ্ছবি। এ কারণে প্রাচীন সিরাতের কিতাবগুলোকে 'মাগাযি' বলে নামকরণ করা হয় এবং ফিকহের কিতাবগুলোতে জিহাদের অধ্যায়কে 'কিতাবুস সিয়ার' বলে নামকরণ করা হয়।

ইখওয়ানের কর্মীদের সর্বপ্রথম কুরআন মাজিদের যে অংশ অধ্যয়ন ও মুখস্থ করার কথা বলা হয়, তা হচ্ছে সূরা আনফাল– যেখানে জিহাদের বিষয়ে বিস্তর আলোচনা এসেছে। এর মাধ্যমে মুসলিমদের মনে জিহাদের চেতনাবোধকে জাগিয়ে তোলা হয়েছে।

ইখওয়ানের শিক্ষা ও সংস্কৃতির অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো, এটি তাদের মধ্যে সামগ্রিকভাবে সম্মান ও মর্যাদার অনুভূতি জাগ্রত করে এবং দান, আত্মত্যাগ ও আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গ করার স্পৃহা সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে সৈনিক হিসেবে মুমিনের বৈশিষ্ট্য যেমন– আনুগত্য, শৃঙ্খলা, ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে সমষ্টি ও সংগঠনের স্বার্থকে বড়ো করে দেখা ইত্যাদির বীজ বপন করে।

এ সকল বৈশিষ্ট্য স্বরূপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল ১৯৪৮ সালে, যখন ফিলিস্তিন রক্ষায় জিহাদের ঘোষণা দেওয়া হয়। সেদিন সর্বত্র দরাজ কণ্ঠে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল– هيي يا ريح الجنة (হে জান্নাতের খুশবো! আমায় ছুঁয়ে যাও), يا خيل الله اركبي (হে আল্লাহর পথের অশ্বরাজি! আমায় রণাঙ্গনে নিয়ে যাও)। এ ঘোষণার সাথে সাথে দাওয়াতের কর্মীরা বিভিন্ন জায়গা থেকে ছুটে আসে। তারা পুণ্যময় ভূমির মর্যাদা রক্ষায় জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পাগলপারা হয়ে যায়। যাতে তারা দুটি কল্যাণের একটি অবশ্যই লাভ করতে পারে– হয় ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিজয়, নয়তো আল্লাহর পথে শাহাদাত।

www.bjilibrary.com

আমি ভুলব না আমার প্রিয় ভাই ও বন্ধু আবদুল ওয়াহাব আল-বাতনুনির কথা, যে ছিল আমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মাধ্যমিকের সহপাঠী। ফিলিস্তিনে জিহাদের জন্য তার প্রচণ্ড আগ্রহ অবিস্মরণীয়। একপর্যায়ে এই জিহাদই তার রাতের স্বপ্ন ও দিনের ব্যস্ততায় পরিণত হয়। কিন্তু তার এ সত্য আগ্রহ বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধক ছিল দুটি :

প্রথম বাধাটি ছিল তাঁর মমতাময়ী মা। সে ছিল তার মায়ের খুব আদুরে সন্তান। বিশেষত তার পিতার মৃত্যুর পর সেই ছিল তার মায়ের একমাত্র অবলম্বন। যে মা তার ছেলেকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারেন না, যদি তার মৃত্যু হয়, তাহলে তাঁর অবস্থা কী হবে? এ কারণে তার মা তাকে জিহাদের অনুমতি দিচ্ছিলেন না; সম্মত হচ্ছিলেন না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সেনাবাহিনীতে তার স্বেচ্ছা অন্তর্ভুক্তিতে। আবদুল ওয়াহাব ছিলেন মায়ের পূর্ণ অনুগত ও সেবায় নিয়োজিত পুত্র। তাই তিনি মায়ের সম্মতি নিয়েই জিহাদে যেতে চাচ্ছিলেন। অতঃপর আবদুল ওয়াহাব আমাদেরকে তাঁর মায়ের কাছে নিয়ে গেলেন, যেন আমরা বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাকে রাজি করাই। আমরা মাকে জিহাদের ফজিলত, দ্বীনের পথে মুজাহিদদের উচ্চ মর্যাদা সম্পর্কে বললাম এবং মুসলিম বীরসেনানীদের ঘটনাবলি এবং তাদের মায়েদের অবস্থান সম্পর্কে আলোচনা করলাম। আমরা তার কাছে বসে গল্পচ্ছলে এগুলো বলতে লাগলাম। একপর্যায়ে তিনি রাজি হলেন, কিন্তু সন্তানের প্রতি মমতায় তার দুচোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল।

আবদুল ওয়াহাব আল-বাতনুনির জিহাদে অংশগ্রহণে দ্বিতীয় বাধা ছিল শিশু-কিশোরদের ব্যাপারে ইখওয়ানের বিধিনিষেধ। ইখওয়ানের সাংগঠনিক নির্দেশনা ছিল– মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রদের কেউ স্বেচ্ছায় জিহাদে যেতে চাইলেও বয়স কম হওয়ার কারণে তাকে যেন অনুমতি দেওয়া না হয়। কিন্তু বাতনুনি এসে আমাদের ধরল, আমরা যেন তার সাথে তানতা থেকে কায়রো যাই, প্রধান দায়িত্বশীলের সাথে তার বিষয়ে কথা বলি এবং তাকে সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার ব্যাপারে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। বিশেষত যখন তার মা তাকে অনুমতি দিয়েছেন। তার পীড়াপীড়ি ও আগ্রহের প্রাবল্যের কারণে আমি, আহমাদ আল-আসসাল ও মুহাম্মাদ সাফতাভি ভাই একসাথে রওয়ানা হলাম এবং উসতায হাসান আল বান্নার কাছে গিয়ে বিষয়টি খুলে বললাম। তার বিষয়ে আমাদের পীড়াপীড়ির একপর্যায়ে ইমাম বান্না আমাদের আবেদন মঞ্জুর করলেন এবং তাকে যুদ্ধের সফরে বের হওয়ার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

www.bjilibrary.com

এ অনুমতির ফলে আমাদের এই সাথির যেন খুশিতে উড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হলো। এ ঘটনা আমাদের শিক্ষক আল-বাহি আল-খাওলি জেনে বললেন– 'আবদুল ওয়াহাবের অন্তরের স্বচ্ছতা যেন শহিদদের অন্তরের স্বচ্ছতার মতো। আমি অনুভব করছি– যখনই তার চেহারার দিকে তাকাই, মনে হয় যেন তাতে শাহাদাতের উষ্ণতা খেলা করছে।'

আবদুল ওয়াহাব আরও কয়েকজন সঙ্গীসহ একটি বীরত্বপূর্ণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। ইহুদিরা একটি বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদের ভান্ডার দখল করে নিলে তারা সেই ভান্ডারটি উড়িয়ে দেয়। একটি বিস্ফোরকদ্রব্যের বাক্সে তারা অগ্নিসংযোগ করে। ফলে মুহূর্তেই বিশাল ভান্ডারটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই অভিযানে আবদুল ওয়াহাব আল-বাতনুনি ও তাঁর তিন সঙ্গী ইল্লিয়্যিন পানে যাত্রা করেন (মৃত্যুর পর নেককার বান্দাদের রুহ যেখানে অবস্থান করে)।

এমন জিহাদি জযবা ও শহিদি তামান্না শুধু যে শহিদ বাতনুনির বেলায় হয়েছিল এমন নয়; বরং এর সংখ্যা ছিল অগণিত। অসংখ্য যুবক-তরুণ উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে হাকস্টেপের প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করে। বহু পিতা ও চাচা তাদের সন্তান ও ভাতিজাদের এমন সংকল্প থেকে বিরত রাখতে এবং ঘরে ফিরিয়ে নিতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সন্তানদের অবিচলতার সামনে তারা ব্যর্থ হন এবং শেষ পর্যন্ত সন্তানদেরকে সম্মতি ও দুআ দিয়ে ক্যাম্প থেকে ফিরে আসেন। এ সকল অভিভাবকরা বিশ্বাস করতে বাধ্য হন যে, এ প্রজন্মের হৃদয় গহিনে ঈমান প্রোথিত হয়ে তাদের অন্তর্জগতে বিপ্লব ঘটিয়েছে, যে কারণে এখন তাদের মনে আল্লাহর পথে মৃত্যুর কোনো ভয় নেই; বরং তারা শাহাদাতের তামান্নায় উদ্দীপ্ত। এমনকি তাদের কেউ কেউ এমনও বলেছে যে– হে আমার স্বজন! আমাকে যেতে দাও। জান্নাত যে আমায় ডাকছে...।

তাদের মধ্যে বহু লোক এমনও আছে, যারা নিদারুণ কষ্টের মুখোমুখি হয়েও জিহাদে অংশগ্রহণের সফর মূলতবি করেনি। কেউ কেউ মালগাড়ির ট্রেনে চড়ে যাত্রা করেছে। কেউ ইখওয়ানের মুজাহিদঘাঁটিতে পৌঁছতে পায়ে হেঁটে সিনা মরুভূমি পাড়ি দিয়েছে! কেউ মুসলিমদের প্রথম কিবলাকে ইহুদিদের কবল থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে একটি বন্দুক বা কামান ক্রয়ের জন্য নিজের সর্বস্ব বিক্রি করেছে। বহু নারী এমন আছে, যারা স্বেচ্ছায় নিজের অলংকার সঁপে দিয়েছে, যেন তাদের স্বামী সেগুলো বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে যুদ্ধাস্ত্র কেনে।

www.bjilibrary.com

এভাবে নারীরা দুই ধাপে ফিলিস্তিনের জিহাদে অংশগ্রহণ করেছে– সবচেয়ে প্রিয় জিনিস (অলংকার) কুরবানি দিয়ে এবং সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি ও ভালোবাসার মানুষকে (স্বামী) জিহাদের যাওয়ার সম্মতি দিয়ে।

হাসান আত-তাভিল-এর ঘটনা আমার সব সময় মনে পড়ে। হাসান ছিলেন পেশায় একজন কৃষক। তার অবস্থান ছিল বাসইয়ুন মারকাযে। তিনিও স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে নাম লেখান। তিনি নিজ পরিবার-পরিজন, খেত-খামারসহ সবকিছু মহান আল্লাহর কাছ থেকে প্রতিদান লাভের আশায় ছেড়ে যান। এখানেই শেষ নয়। তিনি নিজের চাষাবাদের কাজে ব্যবহৃত মহিষ পর্যন্ত বিক্রি করে দেন। অথচ কৃষকদের জন্য একটি মহিষ ব্যবসায়ীর জন্য মূলধনের মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ। নবি-রাসূলগণের আগমনে ধন্য পুণ্যভূমি রক্ষায় যুদ্ধের জন্য মহিষের মূল্য দিয়ে তিনি অস্ত্র ক্রয় করার পরিকল্পনা করেন।

সেই অঞ্চলের প্রধান দায়িত্বশীল আহমাদ আল-বিসস তাকে বললেন– 'হাসান! তোমার পরিবারের জন্য মহিষটি অন্তত রেখে দাও। তোমার জন্য এটিই যথেষ্ট যে, তুমি আগ্রহ নিয়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করছ। তুমি তো জীবন হাতে নিয়ে বের হয়েছ। যারা সশরীরে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তারা অর্থ দিয়ে অংশগ্রহণ করবে।'

তখন কৃষক হাসান যে কথাটি বলেছিলেন, তা ছিল বহু প্রজ্ঞাবানের কথার চেয়েও প্রজ্ঞাপূর্ণ। হাসান বললেন–

> "আল্লাহ তায়ালা কি এমন বলেছেন যে, তোমরা নিজেদের জীবন দিয়ে জিহাদ করো? নাকি তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহর পথে নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে জিহাদ করো? আর তিনি কি আমাদের থেকে শুধু আমাদের জীবন ক্রয় করেছেন? নাকি আমাদের জান্নাত দানের বিনিময়ে তিনি আমাদের জীবন ও সম্পদ উভয়টি ক্রয় করেছেন? আমি কি সেই পবিত্র আয়াত ভুলে যাব, যেখানে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–
>
> ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ...﴾
>
> 'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন জান্নাতের বিনিময়ে।' সূরা তাওবা : ১১১?
>
> তাহলে আপনারা কি এটা চান যে, আমি মূল্য পরিশোধ না করেই পণ্য বুঝে নেব?"

www.bjilibrary.com

তাঁর এ ঈমানদীপ্ত বক্তব্যের সামনে ইখওয়ান নেতা আহমাদ আল-বিসস নির্বাক হয়ে যান। এরপর হাসান তার সাথিদের সাথে যুদ্ধে যান এবং গাজি হয়ে ফিরে আসেন। তবে এ প্রত্যাবর্তনে সম্মান ও অভিবাদনের পরিবর্তে তিনি পুনরায় পরীক্ষা ও কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হন। জায়নবাদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি যে বীরত্ব প্রদর্শন করেছেন, এর শাস্তিস্বরূপই যেন তাকে জেলবন্দি করা হয়! এ সময় বিদেশি মদদপুষ্ট শাসক সাদুদ্দিন সানবাতির সামনে তিনি যে দৃঢ় অবস্থান ব্যক্ত করেন, তা ছিল অকল্পনীয় গৌরব ও মর্যাদার স্মারক।

মুজাহিদদের এই প্রাণোৎসর্গী মনোভাবের কারণে ইহুদিরা তাদের প্রচণ্ড ভয় পেত। মুজাহিদদের কণ্ঠে ধ্বনিত তাকবিরে তারা প্রকম্পিত হতো।

মুজাহিদ নেতা মারূফ আল-হাযারি ইহুদিদের জেলে বন্দি ছিলেন, সেসময় এক ইহুদি কর্মকর্তা তাকে বলে– 'ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে আমাদের আতঙ্কে থাকতে হয়!' তখন মারূফ আল-হাযারি জিজ্ঞেস করলেন– 'তোমরা তাদের এত ভয় পাও কেন? অথচ তাদের সংখ্যা তো কম; অস্ত্রশস্ত্রও অতি দুর্বল!' তখন জায়নবাদী অফিসার বলল– 'আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এখানে ছুটে এসেছি নিরাপদ জীবনের জন্য, আর তারা এখানে এসেছে জীবন দেওয়ার জন্য। জীবনের প্রত্যাশী ও জীবনের মায়া ত্যাগ করে মৃত্যু কামনাকারীর মধ্যে যে বিশাল পার্থক্য– তা কি বলার অপেক্ষা রাখে?'

যুদ্ধের ময়দানে ইখওয়ান নেতাদের যেসব সমস্যায় পড়তে হতো, সেগুলোর একটি হলো– যখন কোনো স্কোয়াড বা নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে সামরিক অভিযানের অংশগ্রহণের দায়িত্ব দেওয়া হতো, তখন অন্যান্য স্কোয়াড বা ব্যক্তিকে নিরত রাখা কঠিন হয়ে পড়ত। তাদের প্রত্যেকে জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহী হয়ে উঠত। এমনকি কখনও কখনও তাদের প্রতিযোগিতা থামানোর জন্য লটারি দিতে হতো। অভিযানের জন্য যে স্কোয়াডটি নির্বাচিত হতো, তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনিতে আশপাশ প্রকম্পিত হতো। তারা উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করত– هيي يا ريح الجنة. 'হে জান্নাতের খুশবো! আমায় ছুঁয়ে যাও!'

উসতায কামিল শরিফ তাঁর الإخوان المسلمون في حرب فلسطين (ফিলিস্তিন যুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলিমিন) গ্রন্থে আবদুল হামিদ আল-খাত্তাব নামের এক তরুণের কথা বর্ণনা করেছেন। সে ছিল অকুতোভয় আলিম শাইখ বাসয়ুনি খাত্তাবের পুত্র। তাকে 'দায়রুল বালহ' যুদ্ধে সেনাঘাটি পাহারার দায়িত্ব দেওয়া হয়।

www.bjilibrary.com

দায়িত্ব বণ্টনের ঘোষণার পর সে কাঁদতে শুরু করে। দলপ্রধানের কাছে গিয়ে অভিযানে যাওয়ার জন্য সে মিনতি জানাতে লাগল। অবশেষে কমান্ডার তাকে অন্যান্য যোদ্ধাদের সাথে অভিযানে পাঠালেন। সে যেমনটি কামনা করেছিল, অতঃপর আল্লাহ তার জন্য তা-ই নির্ধারণ করলেন। এ তরুণ যোদ্ধা আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণ করেন।

আরও আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মুজাহিদদের অনেকের ব্যাপারে আমি শুনেছি– তারা মৃত্যুকে আমন্ত্রণ জানাতে গোসল ও অজু করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। তাদের অন্তরে বিরাজ করত ঈমান, পকেটে থাকত আল-কুরআন, হাতে মেশিনগান। যখন তাদের কেউ গুলিবিদ্ধ হতো, তখন 'আল্লাহু আকবার' ধ্বনি দিয়ে কালিমায়ে শাহাদাত পাঠ করত এবং বলত–

...وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿٨٤﴾

"হে আমার রব! আমি তাড়াতাড়িই আপনার কাছে চলে এলাম, যেন আপনি সন্তুষ্ট হন।" সূরা তহা : ৮৪

যুদ্ধে কামানের গোলার আঘাতে ইখওয়ানের এক কর্মীর পায়ের গোছা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তাঁর করুণ অবস্থা দেখে তার সাথিদের কেউ কেউ কাঁদতে শুরু করে। অথচ আহত ব্যক্তি তখন নিজের পায়ের দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে সাইয়িদুনা খুবাইব রা.-এর বিখ্যাত সেই কবিতা পাঠ করছে–

وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا ... عَلَى أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي.

وَذَلِكَ فِي ذَاتِ الإِلَهِ وَإِنْ يَشَأْ ... يُبَارِكْ عَلَى أَوْصَالِ شِلْوٍ مُمَزَّعِ

মুসলিমের মরণে নেই কোনো ভয়,
সে মরণ যদি আল্লাহর জন্য হয়।
আর কিছু নয়, শুধু রবের সন্তোষ চাই
বিচ্ছিন্ন দেহাংশ পুরিবে বরকতে, খোদার অভিপ্রায়।

বুখারি : ৭৪০২

এক যুদ্ধে দলপতি সাইয়িদ মুহাম্মাদ মানসুর আহত হয়ে মরণাপন্ন হয়ে পড়েন। তিনি ছিলেন শারকিয়ার অধিবাসী। তখন ইখওয়ানের কয়েকজন সদস্য তার সেবায় ব্যস্ত হয়ে পড়েন। কিন্তু সাইয়িদ মানসুর তাদের জোর করে তাড়িয়ে দিয়ে বলেন– 'আমার জীবনের চেয়ে যুদ্ধের গুরুত্ব বেশি।'

www.bjilibrary.com

সাইয়িদ মানসুরকে পেছনের সারিতে নেওয়ার পর তাঁর সংজ্ঞা ফিরে আসা মাত্রই তিনি সর্বপ্রথম বললেন– 'যুদ্ধের অবস্থা কী?' উপস্থিত যোদ্ধারা তাকে সন্তোষজনক জবাব দিলে তিনি মুচকি হাসলেন এবং মৃদু আওয়াজে বললেন– 'আলহামদুলিল্লাহ!' এভাবে জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত তিনি আল্লাহর দরবারে তাঁর দ্বীন ও উম্মাহর জন্য দুআয় রত ছিলেন। একমুহূর্তের জন্যও তাঁর মুখে এ দুআ বন্ধ হয়নি– 'হে আল্লাহ! আপনি আমাদের দাওয়াতকে সহজ করে দিন! আমাদের উদ্দেশ্যকে পূর্ণতা দিন!' এ কথা বলতে বলতেই সাইয়িদ মুহাম্মাদ মানসুর সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে রবের সান্নিধ্যে গমন করেন।

এ সকল দৃষ্টান্ত আমাদের ইসলামের প্রথম যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয় এবং এ কথা প্রমাণ করে যে, এ উম্মাহ সর্বদা কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। এ উম্মাহ আদর্শের মানদণ্ড হলো সেই ইসলাম, যা বীর-বাহাদুর তৈরির কারখানা এবং শক্তি ও ক্ষমতার উৎস। বর্তমানে যারা জাতীয়তাবাদের সুর তোলে, তারা কখনও এই উম্মাহকে সজাগ করে তাদের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারবে না। একমাত্র ঈমানের ডাক ও ইসলামের শিক্ষাই উম্মাহকে আন্দোলিত করার সক্ষমতা রাখে।

উসতায কামিল শরিফ তাঁর 'ফিলিস্তিন যুদ্ধে ইখওয়ানুল মুসলিমিন' গ্রন্থে এমন সব বীরত্বপূর্ণ ঘটনাবলি বর্ণনা করেছেন, যেগুলো আগামী প্রজন্মের সামনে তুলে ধরা উচিত, যেন তা শিক্ষণীয় ও স্মরণীয় হয়ে থাকে। উপরন্তু উসতায কামিল শরিফ এ কথাও উল্লেখ করেছেন যে, এ গ্রন্থে তিনি শুধু নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ ঘটনাবলিই বর্ণনা করেছেন; কোনো শোনা কথা নয়।

ফিলিস্তিন যুদ্ধে মিশরীয় সেনাবাহিনীর কমান্ডার আল-মুওয়াভি ও ফুয়াদ সাদিক গাড়িসংক্রান্ত এক মামলায় আদালতে সাক্ষ্য দেন। সেই সাক্ষ্যদানকালে প্রসঙ্গক্রমে তারা ইখওয়ানের জানবাজ মুজাহিদদের ব্যাপারে এমন সব তথ্য প্রদান করেন, যা শুনে মুমিনের অন্তর প্রশান্ত হয় এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে, তারা আক্রোশের অনলে দগ্ধ হয়।

মুওয়াভি বলেন– 'ইখওয়ানের যোদ্ধারা ইহুদিদের পুঁতে রাখা মাইন তুলে তা নেগেভ মরুভূমিতে বিস্ফোরিত করত।'

ফুয়াদ সাদিক বলেন– 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো সাহসী যোদ্ধাদের দল। তারা তাদের সবটুকু সামর্থ্য ব্যয় করে সুচারুরূপে দায়িত্ব পালন করেছে।'

www.bjilibrary.com

এভাবে আরও একটি যুদ্ধের সমাপ্তি হয়, যেখানে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের বীরত্বগাথা এবং তাদের সামরিক প্রশিক্ষণের ফলাফল স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। সেটি ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সুয়েজ যুদ্ধ। উসতায কামিল শরিফ এ যুদ্ধের ঘটনাবলি নিয়ে المقاومات السرية في قناة السويس 'সুয়েজের গোপন প্রতিরোধ' নামে একটি বই লিখেন।

আমি মনে করি, ইখওয়ানের শহিদদের কথা, বিশেষত আল আযহারের ছাত্র– শহিদ উমর শাহিন, আহমাদ আল-মানিসি, আদিল গানিম প্রমুখের কথা কেউ ভুলতে পারবে না। তারা 'তাল আল-কাবির' যুদ্ধ এবং তার পূর্বাপর ঘটনাগুলোতে নিজেদের পবিত্র রক্ত দিয়ে এ কথা লিখে গেছেন–

> "দখলদাররা কখনও স্বাধীনতা দেয় না; বরং বীর-মুজাহিদরা তাদের রক্তের বিনিময়ে স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনে।"

ইখওয়ানুল মুসলিমিন জিহাদের ব্যাপারে সীমাহীন গুরুত্বারোপ করেছে এবং কার্যত তাতে অংশগ্রহণ করেছে, উপরন্তু শাহাদাতের অমীয় সুধা পানের জন্য রণাঙ্গনে তাদের সর্বোত্তম ব্যক্তিদের প্রেরণ করেছে। তবে এসব সত্ত্বেও ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মতে, সশস্ত্র যুদ্ধই একমাত্র জিহাদ নয়; বরং জিহাদের একটি অংশ। ইখওয়ান মনে করে যে, জিহাদের বিষয়টি সশস্ত্র সংগ্রামের চেয়ে আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত।

ইসলামি ভূখণ্ডের কোনো অংশ অন্যায়ভাবে দখলকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যেমন ফরজ বিধান, কুফরি উপনিবেশের মোকাবিলা করা যেমন দ্বীনের পবিত্র দায়িত্ব, তেমনি মুনাফিক, জালিম ও দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করাও ফরজ ও পবিত্র দ্বীনি দায়িত্ব। এর পবিত্রতা প্রথমোক্ত জিহাদের পবিত্রতার চেয়ে কম মর্যাদাপূর্ণ নয়। পবিত্র কুরআন মাজিদে ইরশাদ হয়েছে–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَٰهِدِ ٱلْكُفَّارَ وَٱلْمُنَٰفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ...﴾

> "হে নবি! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।" সূরা তাহরিম : ৯

একদিন রাসূল সা. সর্বোত্তম জিহাদ সম্পর্কে জানাতে গিয়ে বললেন–

كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ ذِي سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

> "জালিম শাসকের সামনে হক কথা বলা সর্বোত্তম জিহাদ।" ইবনে মাজাহ : ৪০১২; নাসায়ি : ৪২০৯

www.bjilibrary.com

এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলার মোকাবিলা করা বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করার মতোই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উভয়টিই ফরজ জিহাদ।

একদিন নবিজি সা. জালিম শাসকদের সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। জালিম শাসক হলো তারা, যারা এমন বক্তব্য দেয় যে, তাদের কাজের সাথে যার কোনো মিল নেই এবং এমন কাজ করে, তাদের কথার সাথে যার কোনো মিল নেই। মুসলিম উম্মাহর ওপর যদি এমন শাসক চেপে বসে, তাহলে জনগণের করণীয় সম্পর্কে বলতে গিয়ে নবিজি সা. বলেন–

مَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، لَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ.

"যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে বক্তব্যের দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে, সেও মুমিন। এরপর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের অংশ নেই।" আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৯৭৮৪

এ হাদিস দ্বারা প্রতীয়মান হয়, অন্তরের জিহাদ হচ্ছে– অপছন্দ করা, অসন্তোষ ও ঘৃণা প্রকাশ করা এবং সম্পর্ক ছিন্ন করা। এটি ঈমানের সর্বনিম্ন স্তর। এটি ওই ব্যক্তির কর্তব্য, যে কথার দ্বারা প্রতিবাদ করতে সক্ষম নয়। যেমন, কথার দ্বারা জিহাদ ওই ব্যক্তির দায়িত্ব, যে হাতের দ্বারা প্রতিবাদ করতে অক্ষম।

সুতরাং জিহাদ যে শুধু কাফিরদের বিরুদ্ধে হয় এবং জিহাদ যে কেবল তরবারি বা অস্ত্রের মাধ্যমেই হয়– বিষয়টি এমন নয়। আল্লাহ তায়ালা বলছেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ.

"হে নবি! কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন।" সূরা তাওবা : ৭৩; সূরা তাহরিম : ৯

উল্লেখ্য, মুনাফিকরা সাধারণত সরাসরি অস্ত্রের মাধ্যমে মুমিনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে না; ফলে তাদের বিরুদ্ধেও মুমিনদের মোকাবিলা যুদ্ধের ময়দানে হয় না। কারণ, মুনাফিকরা তো বাহ্যত মুসলিমই; বরং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয় কথা, ওয়াজ-নসিহত, প্রচার-প্রচারণা, দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন এবং অন্তরে প্রভাব বিস্তারকারী বক্তব্য দ্বারা।

www.bjilibrary.com

যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ * فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿٦٣﴾

"এরাই ওই সমস্ত লোক যাদের অন্তরে কী আছে, আল্লাহ তায়ালা তা জানেন। সুতরাং আপনি তাদের উপেক্ষা করুন, তাদেরকে সদুপদেশ দিন এবং তাদের প্রতি মর্মস্পর্শী বক্তব্য দিন।" সূরা নিসা : ৬৩

কুরআনের মাজিদের অন্যত্র বলা হয়েছে–

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ﴿٥٢﴾

"(হে নবি!) আপনি কাফিরদের অনুসরণ করবেন না এবং তাদের বিরুদ্ধে এর সাহায্যে (কুরআনের সাহায্যে) কঠোর সংগ্রাম করুন।" সূরা ফুরকান : ৫২

জিহাদের নির্দেশসূচক সূরা ফুরকানের এ আয়াতটি যুদ্ধের নির্দেশ নয়; বরং যুদ্ধের অনুমতি প্রদানের পূর্বেই এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে।

সুতরাং এই জিহাদ হলো– দাওয়াত প্রচার ও তার ওপর অবিচলতা। এর দ্বারা বোঝানো হয়েছে, দাওয়াতের পথের তিক্ততাগুলো মেনে নেওয়া এবং এ পথের নানা প্রকার কষ্ট ও দীর্ঘসূত্রিতার ওপর ধৈর্যধারণ করা। সূরা আনকাবুতের একটি আয়াতেও এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে–

وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

"যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যই কষ্ট স্বীকার করে। নিশ্চয় আল্লাহ বিশ্ববাসী থেকে অমুখাপেক্ষী।" সূরা আনকাবুত : ৬

রাসূল সা. কাফিরদের বিরুদ্ধে জিহাদের উপকরণ এবং তার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন–

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ.

"তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করো হাত, অর্থসম্পদ ও মুখের ভাষা দ্বারা।" মুসনাদে আহমাদ : ১২২৪৬

www.bjilibrary.com

এ জিহাদ ছাড়াও আরেকটি জিহাদ আছে। আর তা হচ্ছে– নফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ। এই জিহাদের পদ্ধতি হলো– ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন, ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলা, এর দিকে মানুষকে আহ্বান করা এবং ইসলামের পথে অটল থাকা, যতক্ষণ-না মহান আল্লাহ দ্বীনের পথে শাহাদাত বা বিজয় দুটির কোনো একটি দান করেন।

আরেক প্রকার জিহাদ হলো– শয়তানের বিরুদ্ধে জিহাদ। কারণ, শয়তান মানুষের অভ্যন্তরে ঢুকে তার বিরুদ্ধে লড়াই করে। শয়তান বিভিন্ন সংশয় সৃষ্টি করে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে বিভ্রান্ত করে অথবা রিপুর কামনা-বাসনাকে উত্তেজিত করে তার ইচ্ছাশক্তিকে বিপথগামী করে। অতএব, শয়তানের মোকাবিলা করতে ইয়াকিনের (দৃঢ় বিশ্বাস) হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে– যা শয়তান সৃষ্ট সংশয়গুলো দূরীভূত করবে। অনুরূপ সবরের হাতিয়ার ব্যবহার করতে হবে, যা রিপুর কামনা-বাসনাগুলো দুমড়ে-মুচড়ে দেবে। এর মাধ্যমে মানুষ তার চিরশত্রু শয়তানের বিরুদ্ধে বিজয় লাভ করতে পারে এবং সবর ও ইয়াকিনের ডানায় ভর করে দ্বীনি বিষয়ে নেতৃত্বের স্তরে পৌঁছতে পারে। যেমনটি মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا ۖ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

"আমি তাদের মধ্য থেকে বহু নেতা বানিয়েছি, যেন তারা আমার আদেশ অনুযায়ী সৎপথ প্রদর্শন করে। (নেতৃত্বের এই মর্যাদা তাদের দেওয়া হয়েছে) এই কারণে যে, তারা ধৈর্যধারণ করেছিল আর তারা আমার আয়াতসমূহের প্রতি রাখত দৃঢ় বিশ্বাস।" সূরা সাজদা : ২৪

এটি হলো ইসলামে জিহাদের বিস্তৃত অর্থ। আরেক প্রকার জিহাদ হলো– নিজের ভাইদের বোঝানো, তাদের সঠিক তারবিয়াত দেওয়া এবং তাদের সাথে সুন্দর আচরণের মাধ্যমে জিহাদ করা।

এই দাওয়াতি আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসান আল বান্না তাঁর *রিসালাতুত তাআলিম* পুস্তিকায় জিহাদের অর্থের ব্যাখ্যা দেন। তিনি জিহাদকে ইসলামের আলোকে যেভাবে অনুধাবন করেছেন এবং তার অনুসারীদের থেকে যেভাবে এর সমঝ প্রত্যাশা করেন, তার ভিত্তিতে তিনি বলেন–

"আমি জিহাদ দ্বারা বোঝাতে চাই ওই ফরজ বিধানকে, যা কিয়ামত পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। রাসূল সা.-এর নিম্নোক্ত বাণীতে সেটিই উদ্দেশ্য–

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ نَفْسَهُ بِغَزْوٍ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ نِفَاقٍ.

www.bjilibrary.com

'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে– সে জিহাদও করেনি, জিহাদের নিয়তও করেনি; তার মৃত্যু যেন মুনাফিকির একটি শাখার ওপর হলো।' মুসলিম : ১৯১০

জিহাদের প্রাথমিক স্তর হলো– অন্তর দ্বারা ঘৃণা করা। আর জিহাদের সর্বোচ্চ স্তর হলো– আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রাম করা। আর এতদুভয়ের মধ্যবর্তী স্তর হলো– মুখের ভাষা, কলম, হাত ও অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলার দ্বারা জিহাদ করা।

জিহাদ ছাড়া দাওয়াত সঞ্জীবিত হয় না। দাওয়াত যত সমুন্নত ও বিস্তৃত হবে, জিহাদের মাহাত্ম্য, দাওয়াতি কাজে সংগৃহীত অর্থের গুরুত্ব ও কর্মীদের সওয়াবের বিশালতা ততই বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ...﴾

'তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।' সূরা হজ : ৭৮"

ইখওয়ানের সদস্যদের জিহাদের এ বিস্তৃত অর্থ শিক্ষাদানের ফলে তারা ইসলামি চিন্তা-দর্শনের জগতেও জিহাদ করছে, যেমনটি তারা জিহাদ করছে মুসলিম ভূখণ্ড রক্ষায়। অধিকন্তু চিন্তা-দর্শনই তো মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য; আর ভূখণ্ড হলো তার পাত্র ও মাধ্যম। এ কারণে ইখওয়ানের সদস্যরা দেশের অভ্যন্তরে তাগুতের মোকাবিলায় তৎপর হয়েছে, যেমনটি তৎপর হয়েছে দেশের বাইরের তাগুতের মোকাবিলায়। তারা প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের বিরুদ্ধে, যেমনটি প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে অত্যাচারী ও ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে। যারা মুসলিম ভূখণ্ডের ওপর জুলুমের কালো হাত বিস্তার করে, আর যারা ইসলামি শরিয়াহর ওপর অন্যায় হস্তক্ষেপ করে– ইখওয়ান তাদের উভয় শ্রেণিকেই মোকাবিলা করেছে। এ কারণে ইখওয়ানের সদস্যরা যেমন ভূখণ্ডের স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে, তেমনি শরিয়তকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতেও সংগ্রামে জড়িয়েছে। ফলে কাফির, ইহুদি, ইংরেজদের হাতে যেমন তাদের রক্ত ঝরেছে, তেমনি মুসলিম নামধারী তথাকথিত ফাসিক-জালিম শাসকদের হাতেও তারা রক্তাক্ত হয়েছে। তারা যেমন ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে এবং যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে শাহাদাতবরণ করেছে, তেমনি লিমান তারা কারাগার, সামরিক কারাগারসহ অন্যান্য জেলখানাগুলোতেও তারা জুলুম ও নিপীড়ন ভোগ করেছে।

www.bjilibrary.com

দেশের অভ্যন্তরে ও দেশের বাইরের গোপন ও প্রকাশ্য বহু শক্তি ইখওয়ানের সদস্যদের অর্থ ও পদের লোভ দেখিয়ে কিনে নিতে চেয়েছে। এভাবে তারা এ আন্দোলনের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে ইখওয়ানকে দমিয়ে ফেলতে বহুবিধ চেষ্টা করেছে। কিন্তু প্রভাবশালী ও ক্ষমতাধর শক্তিগুলো ইখওয়ানের সদস্য ও তার নেতৃবৃন্দের থেকে সামান্যতম সাড়াও পায়নি; বরং তারা যা পেয়েছে তা হলো, প্রবল অস্বীকৃতি ও কড়া জবাব–

أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾

"তোমরা কি আমাকে অর্থ-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও। বস্তুত আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা, তোমাদের যা দিয়েছেন তা থেকে উৎকৃষ্টতর। অথচ তোমরা তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে উৎফুল্লবোধ করছ।" সূরা নামল : ৩৬

এই শক্তিগুলো তাদের প্রলোভনের কৌশল ব্যর্থ হওয়ার পর হুমকি প্রদানের কৌশল অবলম্বন করে এবং প্ররোচনায় ব্যর্থ হয়ে ভীতি প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করে। কিন্তু এ সকল হুমকি–ধমকি ও ভীতি প্রদর্শনের কৌশলটি প্রলোভন ও প্ররোচনার কৌশলের মতোই ভন্ডুল হয়ে গেছে। উভয় প্রকার তির তার নিক্ষেপকারীর বুকে বুমেরাং হয়ে ফিরেছে। এভাবে প্রলোভন ও ভীতি প্রদর্শনের পর তারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কাছে যা পেয়েছে তা হলো, দাওয়াতের কাজে নিষ্ঠা ও অবিচলতা। যদিও তারা ইখওয়ানকে আগুনে জ্বালিয়ে দেওয়ার কিংবা তাদের ওপর ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর হুমকি দিয়েছে অথবা ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে চন্দ্র রেখে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছে, কিন্তু এই সবকিছু মরীচিকার ন্যায় নিষ্ফল প্রমাণিত হয়েছে।

ইসলাম ও মুসলিমদের কল্যাণে ইখওয়ানের এ গর্বিত অস্বীকৃতি ও দৃঢ় অবস্থান তাদের ওপর বহু ঝড় নিয়ে এসেছে। এ আন্দোলনকে ব্যর্থ করতে, এর গতি-প্রকৃতি পালটে দিতে সকল প্রকার প্রলোভন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যানের কারণে এই আন্দোলন শিকার হয়েছে অগণিত ষড়যন্ত্রের। ইখওয়ানের বিরুদ্ধে হয়েছে অসংখ্য চক্রান্ত। এমনকি ইখওয়ানকে সমূলে উৎপাটনের সম্ভাব্য সবটুকু চেষ্টাই তারা করেছে। এটিই হলো সেই রহস্য, যার কারণে এই সংগঠন অনবরত কঠিন পরীক্ষা ও বর্বরতম হামলার শিকার হয়েছে এবং একটি বিপদের রেশ কাটতে না কাটতেই নতুন আরেকটি বিপদের সম্মুখীন হয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানুল মুসলিমিন এতসব বাধাবিপত্তির সামনেও মাথানত করেনি। নত হয়নি দুর্যোগের শিকার হওয়ার পূর্বে প্রলোভন ও হুমকির সামনে। দুর্যোগকালে ঝড়ঝঞ্ঝা ইখওয়ানকে নোয়াতে পারেনি। দুর্যোগ শেষ হওয়ার পরও তারা ক্লান্ত হয়নি; বরং ইখওয়ানের সদস্যরা সাহসের সাথে সব বিপদাপদ হাসিমুখে বরণ করে নিয়েছে এবং বীরের ন্যায় অবিচলতা দেখিয়েছে। বলা চলে, ইখওয়ানের সদস্যদের এ অবিচলতা ছিল ওইসকল মুমিনের প্রতিচ্ছবি, যারা আল্লাহর সাথে কৃত তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছে।

কখনও কখনও বিচ্ছিন্নভাবে ইখওয়ানের সদস্যদের কেউ কেউ অসহনীয় নিপীড়ন ও জুলুমের মুখে সামান্য দুর্বলতা দেখিয়েছে এবং কোথাও-বা তাগুতের পক্ষে মুখে দুয়েক কথা বলেছে। মূলত এর মাধ্যমে তারা জালিমের জিন্দানখানা থেকে মুক্তিলাভের চেষ্টা করেছে মাত্র। এ সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তারা দলিল হিসেবে গ্রহণ করেছে মহান আল্লাহর বাণী–

...إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ... ﴿١٠٦﴾

"তবে যাকে কুফরিতে বাধ্য করা হয়; অথচ তার অন্তর ঈমানে অবিচল।" সূরা নাহল : ১০৬

নিজেদের অবস্থানের প্রতি সামগ্রিকভাবে ইখওয়ান সদস্যদের ছিল পূর্ণ আস্থা। তাই তাদের বক্ষ কুফরির জন্য উন্মোচিত হয়নি, তাই তারা জুলুমের প্রশংসায় একটি অক্ষরও লেখেনি এবং ইসলামের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হয়নি। তাদের মধ্য হতে কেউ কেউ সামান্য সময়ের জন্য দুর্বলতা দেখালেও অতি সত্বর লজ্জিত হয়েছে এবং দুঃখভারাক্রান্ত হৃদয়ে কেঁদে-কেটে আল্লাহর দরবারে তাওবা ও ইসতিগফার করেছে। অতঃপর অনুতাপ ও কৈফিয়ত পেশ করে প্রাণের ঠিকানায় ফিরে এসেছে, পুনরায় জোর কদমে শামিল হয়েছে প্রিয় কাফেলার পথচলায়।

সমাজকল্যাণ

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে যে, একজন মুসলিমের জীবনের অন্যতম লক্ষ্য হলো– মানুষের কল্যাণে, সমাজের কল্যাণে কাজ করা। কুরআন মাজিদে মানবজীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের তিনটি শাখার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। প্রথম শাখাটি হলো– ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। দ্বিতীয় শাখা হলো– জনকল্যাণমূলক কাজের

www.bjilibrary.com

মাধ্যমে মানুষের সাথে, সমাজের সাথে সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। আর তৃতীয় শাখাটি হলো– জিহাদের মাধ্যমে ইসলামের শত্রুদের সাথে বৈরী সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٧﴾ وَ جَاهِدُوا فِي اللهِ حَقَّ جِهَادِهِ... ﴿٧٨﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা রুকু করো, সিজদা করো, তোমাদের রবের ইবাদত করো এবং সৎকর্ম করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো। আর আল্লাহর পথে এমনভাবে জিহাদ করো, যেভাবে জিহাদ করা উচিত।" সূরা হাজ : ৭৭-৭৮

অনেক হাদিসে এ বিষয়ে জোর তাকিদ করা হয়েছে। হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো– প্রতিদিন নিজের সম্পদ, খ্যাতি, কর্মক্ষমতা, চিন্তা ও কথা দ্বারা সমাজকল্যাণে কাজ করা।

সাইয়িদুনা আবু মুসা আশআরি রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন–

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ: فَيَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَوْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُعِينُ ذَا الحَاجَةِ المَلْهُوفَ. قَالُوا: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيَأْمُرُ بِالخَيْرِ. أَوْ قَالَ: بِالمَعْرُوفِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ؟ قَالَ: فَيُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَإِنَّهُ لَهُ صَدَقَةٌ.

"নবিজি সা. বললেন– 'প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য হলো, সদাকা করা।' সাহাবায়ে কিরাম জানতে চাইলেন– 'যদি কারও সদাকা করার মতো কিছু না থাকে, তাহলে তার করণীয় কী (ইয়া রাসূলাল্লাহ)?' রাসূল সা. বললেন– 'সে দুই হাত দিয়ে উপার্জন করবে, অতঃপর নিজের কল্যাণেও ব্যয় করবে, সদাকাও করবে।' সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন– 'যদি সে সামর্থ্য কারও না থাকে, তাহলে কী করণীয়?' নবিজি সা. বললেন– 'দুস্থ ও অভাবীকে সাহায্য করবে।' পুনরায় প্রশ্ন করা হলো– 'তাও যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কী করবে?' নবিজি সা. বললেন– 'ভালো কাজের আদেশ করবে।' প্রশ্নকারী আবার বললেন– 'তাতেও যদি কেউ সমর্থ না হয়, তাহলে কী করণীয়?' নবিজি সা. বললেন– 'অন্যায় কাজে বাধা দেবে। কারণ, এটিও একটি সদাকা'।" বুখারি : ৬০২২

www.bjilibrary.com

এই হাদিসের আলোকে ইখওয়ানের প্রত্যেক কর্মী সমাজের একেকজন সক্রিয় সদস্য। প্রত্যেক ইখওয়ান কর্মী একেকজন সমাজকর্মীও। তারা মানুষের কল্যাণে কাজ করে, মানুষকে ভালো কাজের কথা বলে, মন্দ কাজকে ঘৃণা করে এবং মানুষকে তা থেকে নিষেধ করে। অভাবীকে আর্থিক সহায়তা করে, দুর্বলকে সাহায্য করে, নিরক্ষরকে শিক্ষাদান করে। উদাসীনকে সতর্ক করে, পাপীকে ভীতি প্রদর্শন করে, বিস্মৃতকে স্মরণ করিয়ে দেয়। অসুস্থের সেবা, মৃতের জানাযা ও শেষ বিদায়ে অংশগ্রহণ, মৃতের শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সমবেদনা জানানো ইখওয়ান কর্মীদের নিয়মিত কাজ। তারা এতিমকে সম্মান করে, অভাবীকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করে এবং সামাজিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডেও অংশগ্রহণ করে।

ইখওয়ানের প্রতিটি শাখাই হচ্ছে সমাজ সংস্কারকেন্দ্র এবং জাতির সেবাকেন্দ্র। আর ইখওয়ানের লক্ষ্য হচ্ছে– শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, সামাজিক দায়বোধ এবং দ্বীনি ও স্বাস্থ্যগত দিক-নির্দেশনা ইত্যাদি সম্ভাব্য সকল উপকরণের সাহায্যে জাতির সেবা নিশ্চিত করা।

ইখওয়ানের 'সমাজসেবা ও জনকল্যাণ বিভাগ' বহু হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। সেখানে নামমাত্র মূল্যে অথবা অভাবীদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। এ বিভাগটি যাকাত ও সদাকা সংগ্রহ করে তার হকদারদের মধ্যে বণ্টন করে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। কুরআন হিফজ এবং বয়স্কদের শিক্ষার জন্য বহু মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করে। নতুন নতুন মসজিদ নির্মাণ করে, পুরাতন মসজিদ মেরামত করে সেখানে ইবাদত ও হিদায়াতের কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কমিটি গঠন করে। সমাজে বিভিন্ন সময় যেসব জটিলতার উদ্ভব হয়, সেগুলোর নিরসন করে সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণের প্রতিবন্ধকতাগুলো দূরীকরণে ভূমিকা পালন করে।

এক্ষেত্রে ইখওয়ানের দর্শন স্পষ্ট, যা ইসলামের প্রকৃত রূপ থেকে সংগৃহীত এবং এর রূপায়ণ ঘটে প্রত্যেক মুসলিমের জীবনে এবং মুসলিম জামায়াতের ক্ষেত্রেও। কিন্তু কিছু মানুষ ইখওয়ানের সমাজসেবামূলক কর্মকাণ্ডের প্রতি আপত্তি তোলে; যেমন– হিযবুত তাহরিরের লোকজন। তাদের যুক্তি হলো– এটি একদিকে যেমন দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, তেমনি এটি হবে জোড়াতালিযুক্ত একটি নিরর্থক প্রচেষ্টা। অধিকন্তু তা ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি ও প্রচেষ্টাকে স্থবির করে দেবে।

www.bjilibrary.com

বাস্তবে তারা কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে উদাসীন। সে বিষয়গুলো হলো :

এক. জনকল্যাণমূলক কাজ মুসলিমদের জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে নির্দেশ দিয়েছেন, যেমনটি আমরা ইতঃপূর্বে কুরআন ও হাদিসের দলিলসহ বর্ণনা করেছি। সুতরাং একজন মুসলিমকে যেমন নামাজ ও অন্যান্য ইবাদতের আদেশ করা হয়েছে, তেমনি জনকল্যাণমূলক কাজ করা ও তার দিকে আহ্বানেরও আদেশ করা হয়েছে।

দুই. প্রত্যেক মুসলিম সমাজের একেকজন সক্রিয় ও কর্মমুখর সদস্য। কাজেই মানুষের দুঃখ-বেদনা অনুভব করা তার সাধারণ বৈশিষ্ট্য। অতএব, সমাজের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা দূর করা বা কমপক্ষে তা লাঘব করার চেষ্টা করা প্রত্যেক মুসলিমের দায়িত্বের অন্তর্ভুক্ত। একজন ক্ষুধার্ত ও পীড়িত ব্যক্তিকে সাহায্য করা অথবা তাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও নিষ্ক্রিয় থাকা কিংবা কেবল নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ও খুশি থাকার সুযোগ ইসলামে নেই।

তিন. জনকল্যাণমূলক কাজও স্বয়ং একপ্রকারের দাওয়াত। কারণ, দাওয়াত যেমন মুখের কথা বা লেখালিখি দ্বারা হতে পারে, অনুরূপ জনহিতকর কাজ ও পরোপকারের মাধ্যমেও হতে পারে। সাধারণত মিশনারি সংস্থা ও সংগঠনগুলো বিশেষ গুরুত্বের সাথে এ কাজটি করে থাকে।

চার. সাংগঠনিকভাবে বা সামষ্টিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে সমাজসেবা করা তুলনামূলক সহজ; যদিও বুদ্ধিবৃত্তিক বা দক্ষতামূলক কাজ দলবদ্ধভাবে করা সব সময় সহজ হয় না। কাজেই এ সামর্থ্য ও সুযোগ থাকার পরও তা থেকে বিমুখ হওয়া উচিত নয়; বরং এর সদ্ব্যবহার একান্তই কাম্য।

রাজনীতি

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো– রাজনীতি। এই রাজনৈতিক তৎপরতার কর্মক্ষেত্র হচ্ছে– শাসনক্ষমতা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা-সম্পর্কিত বিষয়াবলি, জনগণের সাথে রাষ্ট্র ও প্রশাসনের সম্পর্ক, এক রাষ্ট্রের সাথে অন্যান্য রাষ্ট্রের সম্পর্ক– তা ইসলামি রাষ্ট্র হোক বা অনৈসলামি, দখলদার ঔপনিবেশিকদের ব্যাপারে অবস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি।

www.bjilibrary.com

এই দিকটি ইমাম হাসান আল বান্নার তাঁর চিন্তাধারা ও দাওয়াত প্রচারের পূর্বে অন্যান্য ইসলামি দলগুলোর চিন্তা-ভাবনা থেকে বহু দূরে অবস্থান করছিল। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, বিভিন্ন দ্বীনি অঙ্গন ও সংগঠনসমূহের চিন্তা-ভাবনা ও কাজের পরিধির মধ্যে রাজনীতি ছিল সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। বরং রাজনীতিকে দ্বীনের বিপরীতে দাঁড় করানো হয়েছিল; যেমন– সাদা কালোর বিপরীত। কাজেই কোনো ব্যক্তি বা দলের মধ্যে উভয় গুণের সমাবেশ ছিল একটি অকল্পনীয় বিষয়। তখন মানুষ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল– ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। অনুরূপভাবে দল বা সংগঠনেরও দুটি ভাগ ছিল– ধর্মীয় সংগঠন ও রাজনৈতিক সংগঠন।

সেসময় ধর্মীয় ব্যক্তিদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণকে অনেকটা নিষিদ্ধ মনে করা হতো। আবার নিষিদ্ধ মনে করা হতো রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ধর্মকর্মে অংশগ্রহণকেও। অনুরূপ রাজনৈতিক বিষয়ে ধর্মীয় দলগুলোর হস্তক্ষেপ কিংবা ধর্মীয় বিষয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর হস্তক্ষেপ ছিল নিষিদ্ধ বিষয়। তবে রাজনৈতিক ব্যক্তি বা দল ধর্মীয় বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে তা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখা হতো বা তাতে শিথিলতা দেখানো হতো। কিন্তু এর বিপরীতে ধর্মীয় ব্যক্তি বা সংগঠন রাজনৈতিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে চাইলে এক্ষেত্রে শিথিলতার কোনো সুযোগ ছিল না; বরং এটিকে ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ বলেই বিবেচনা করা হতো।

এরই ভিত্তিতে মিশর ও অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে বিভিন্ন দ্বীনি সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। যেমন, সুফিদের দল। এ ছাড়াও অন্যান্য সংগঠন ও সংস্থা– যার পরিচিতিপত্র বা গঠনতন্ত্রেই এ কথা লেখা থাকে যে– 'এটি একটি অরাজনৈতিক সংগঠন'; অর্থাৎ, রাজনীতির সাথে এর কোনো সম্পর্ক নেই।

এর বিপরীতে আরেক প্রকার সংগঠন আছে, দ্বীনের সাথে যার কোনো সম্পর্ক নেই। যেগুলোকে আহযাব, পার্টি, দল ইত্যাদি নামে নামকরণ করা হয়। যেমন– আল-হিযবুল ওয়াতানি (জাতীয়তাবাদী দল), হিযবুল উম্মাহ, হিযবুল ওয়াফদ ইত্যাদি। এ ছাড়াও আছে হিযবুদ দুসতুর (সাংবিধানিক দল)। এ সকল দল রাজনীতিতে ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। এসব দলের তাত্ত্বিক দর্শন ও প্রায়োগিক আচরণের ভিত্তি হলো– দ্বীনকে রাষ্ট্র থেকে এবং রাষ্ট্রকে দ্বীন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে।

www.bjilibrary.com

এসব দল ও পার্টি সংকীর্ণ আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। তারা প্রাচীন জাহিলি মতবাদ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিকে প্রাচীন জাতীয় ঐতিহ্যের নামে পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। যেমন– মিশরের ফেরাউনি মতবাদ, সিরিয়ায় ফিনিশিয়ান মতবাদ, ইরাকে অ্যাসিরিয়ান মতবাদ ইত্যাদি। আবার কেউ কেউ অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস না করলেও জাতি বা গোষ্ঠীভিত্তিক জাতীয়তাবাদে বিশ্বাস করে। যেমন– তুরস্কে তুরানি জাতি, আরব বিশ্বে আরব জাতি, বৃহত্তর সিরিয়ায় সিরিয়ান জাতি।

আমাদের সমাজে ধর্ম ও রাজনীতির বিষয়ে যে ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছে, সে ধারণার গোড়াপত্তন করেছে অজ্ঞতা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ। এর তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছে সাংস্কৃতিক উপনিবেশবাদ। ফলে এই বিষবৃক্ষের শেকড় গভীরে পৌঁছে গেছে এবং ডালপালা বিস্তৃত আকারে ছড়িয়ে পড়েছে। এ ভ্রান্ত ধারণাকে বিতাড়িত করতে ইমাম হাসান আল বান্নাকে জটিল সব সংকটের মুখোমুখি হতে হয়েছে এবং কঠিন সংগ্রামে করতে হয়েছে। তখন বিশুদ্ধ চিন্তার সাথে ভ্রান্ত চিন্তার সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে।

এ বিষয়ে যথার্থ ও সঠিক চিন্তা হলো– ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যেখানে মানবজীবনের প্রতিটি অধ্যায়ের পূর্ণাঙ্গ দিক-নির্দেশনা রয়েছে। রাজনীতিও তেমনি একটি অধ্যায়। কুরআন মাজিদ, হাদিসে নববি, রাসূলে কারিম সা.-এর পথনির্দেশ, সাহাবায়ে কেরামের জীবনচরিত এবং তেরো শতাব্দী বা তারও অধিককাল ধরে উম্মতের কর্মধারা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

এ ব্যাপারে শহিদ হাসান আল বান্নার কিছু বক্তব্য আছে, যেগুলো ইখওয়ানের প্রায় সকল সদস্যের মুখস্থ। তন্মধ্যে একটি বক্তব্য, যা একটি পুস্তিকায়ও তিনি উল্লেখ করেছেন, তা হলো–

> "যদি তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হয়– 'তোমরা কীসের দাওয়াত দিচ্ছ?' তাহলে তোমরা বলবে– 'আমরা মুহাম্মাদ সা. আনীত ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। আর শাসনব্যবস্থা তারই একটি অংশ এবং স্বাধীনতা তারই একটি আবশ্যিক বিধান।'
>
> তোমাদের যদি বলা হয়– 'এটি তো রাজনীতির কথা!' তাহলে তোমরা বলবে– 'এটি ইসলামেরই কথা। আর আমরা ইসলামের সামগ্রিকতায় কোনো বিভাজন মানি না'।"

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানের রাজনৈতিক দর্শনের ভিত্তি

ইমাম হাসান আল বান্নার রাজনৈতিক দর্শন শিক্ষার কিছু মৌলিক ভিত্তি রয়েছে। এর গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি ভিত্তি নিম্নরূপ :

এক. মুসলিম ভূখণ্ড সমূহ স্বাধীন করা

ভিনদেশি শাসকদের থেকে মুসলিম ভূখণ্ডকে স্বাধীন করা আবশ্যক– এ অনুভূতি ও চেতনাকে অন্তরে বদ্ধমূল করা। অনুরূপ মুসলিম দেশসমূহ থেকে সম্ভাব্য সকল উপায়ে দখলদার ঔপনিবেশিকদের বিতাড়িত করা। এর সূচনা হবে ক্ষুদ্র স্বদেশ থেকে। স্বদেশের পরিধি হলো, নীল উপত্যকার উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত– মিশর ও সুদান। আর বৃহত্তর স্বদেশের সীমানা হলো– মহাসাগর থেকে উপসাগর পর্যন্ত। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আরব ভূখণ্ডের এই বৃহৎ সীমানার কথা আমি সর্বপ্রথম শুনেছি ইমাম হাসান আল বান্না রহ.-এর মুখ থেকে। আর বৃহত্তর মুসলিম ভূখণ্ডের সীমানা হলো প্রশান্ত মহাসাগর থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত। পূর্বে ইন্দোনেশিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ থেকে পশ্চিমে মারাকেশ পর্যন্ত।

এ ধারণার ভিত্তিতে 'মুসলিম ভাই' পরিভাষাটি ব্যাপকতা লাভ করে। তা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল মুসলিমকে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। কাজেই একজন প্রকৃত মুসলিম হালের রাজনৈতিক দলগুলোর মতো কখনও নিজেকে সংকীর্ণ মাতৃভূমি বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

এ দৃষ্টিকোণ থেকে মিশরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের স্বদেশ উদ্ধার ও এর স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবিসমূহের ব্যাপারে সোচ্চার হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মিশর ও সুদান থেকে ইংরেজদের বিতাড়ন এবং নীল উপত্যকায় সংহতি গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে ইখওয়ান। অতঃপর এই কর্মসূচির আওতায় ইখওয়ান সমগ্র মিশর জুড়ে এবং বৃহৎ শহরগুলোতে বিশাল বিশাল সম্মেলনের আয়োজন করে। আমি এখানে বিনা দ্বিধায় বলছি– আলোচ্য দাবিগুলো আমি প্রথমে ভালো করে বুঝিনি। তবে তানতা সম্মেলনে ইমাম হাসান আল বান্নার মুখে প্রথম এই দাবিগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা এবং নীতিমালার সাথে এগুলোর সামঞ্জস্য বুঝতে সক্ষম হই।

এ সম্মেলনগুলোতে ইমাম আল বান্না আন্দোলনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণের বিশদ ব্যাখ্যা প্রদান করেন। যেমন– আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের কাছে দাবি উত্থাপন, বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন,

www.bjilibrary.com

ঔপনিবেশিকদের কোণঠাসা করতে তাদের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ এবং তাদের উৎপাদিত পণ্য বর্জন। সেইসাথে পবিত্র জিহাদের ঘোষণা ও তার জন্য এই প্রত্যয় নিয়ে মুজাহিদদের তালিকাভুক্তির কার্যক্রম শুরু হয়– হয়তো আমরা স্বাধীন সুখময় জীবনযাপন করব অথবা নেককার শহিদ হিসেবে কবরদেশের যাত্রী হবো।

আমার এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে, সেই সম্মেলনে মুরশিদ ও শহিদ ইমাম বান্না উক্ত অবরোধমূলক হাতিয়ার, তার কার্যকারিতা এবং মিশর জাতির সেই হাতিয়ার ব্যবহারের সক্ষমতা সম্পর্কে আলোচনা করছেন। আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেন– 'মিশরবাসীরা হলো অল্পে তুষ্ট ও ধৈর্যশীল জাতি; সংকটকালে তারা অল্পে তুষ্ট ও সন্তুষ্ট হতে সক্ষম।' ইমাম বান্না নিজের এই বক্তব্যের সমর্থনে মিশরবাসীর বীরত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক ও ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাবলি উল্লেখ করে শ্রোতাদের উদ্দীপ্ত করেন।

সেদিন ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর বক্তব্যে এ কথাও বলেন যে, আমরা ইবনে হাযমের সেই ফাতওয়াও সামনে নিয়ে আসব– মুশরিক শত্রুরা আদ্যোপান্ত নাপাক। তাকে স্পর্শ করা এবং তার সাথে কোনোরূপ লেনদেন করা জায়েয নেই। কেননা, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন–

...إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ... ﴿٢٨﴾

"নিশ্চয় মুশরিকরা নাপাক।" সূরা তাওবা : ২৮

ইমাম হাসান আল বান্না এর সাথে আরেকটি বিষয় সংযোজন করেন। তিনি বিশেষভাবে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যদের এবং সাধারণভাবে নীল উপত্যকার সকল মুসলমানদের আহ্বান জানিয়েছেন, তারা যেন প্রতি নামাজের শেষ রাকাতে, বিশেষ করে জাহরি নামাজে (অর্থাৎ, যে সকল নামাজে উচ্চৈঃস্বরে কেরাত পাঠ করতে হয়) রুকু থেকে দাঁড়িয়ে কুনুতে নাযেলা পাঠ করে। কুনুতে নাযেলা বলা হয় ওই দুআকে– যে দুআ প্রচণ্ড বিপদ ও দুর্যোগকালে পাঠ করা হয়, যেন আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের ওপর থেকে সেই দুর্যোগ উঠিয়ে নেন এবং দুশ্চিন্তা ও বিপদ থেকে পরিত্রাণ দান করেন। নবি কারিম সা. থেকে এ আমল প্রমাণিত। আল্লাহর রাসূল অত্যাচারী মুশরিকদের বিপক্ষে এবং নির্যাতিত ও দুর্বল মুসলিমদের সপক্ষে নামাজে এ কুনুত পাঠ করতেন। আর এ কথা সুবিদিত যে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব হারানো এবং মুসলিমদের ওপর কাফিরদের চেপে বসার চেয়ে বড়ো কোনো বিপদ নেই।

www.bjilibrary.com

ইমাম হাসান আল বান্না কুনুতে নাযেলা হিসেবে একটি বিশেষ দুআ করতেন। মুসল্লিগণ এ দুআ অথবা এ জাতীয় দুআ পাঠ করতে পারে। আমি এ দুআ নামাজে এত বেশি পাঠ করেছি যে, দীর্ঘ তিন যুগ পেরিয়ে যাওয়ার পরও সেই দুআ এখনও আমার হুবহু মনে আছে। দুআটি হলো–

اللهم رب العالمين، وأمان الخائفين، ومذل المتكبرين، وقاصم الجبارين، تقبل دعاءنا، وأجب ندائنا. اللهم إنك تعلم أن هؤلاء الغاصبين من الإنجليز قد احتلوا أرضنا، وغصبوا حقنا..وطغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد.. اللهم فرد هنا كيدهم، وفل حدهم، وأدل دولتهم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، وخذه ومن وادهم أو عاونهم أو ناصرهم أخذعزيز مقتدر... أللهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين.

"হে আল্লাহ, বিশ্বজগতের প্রতিপালক, ভীত-সন্ত্রস্তদের নিরাপত্তা দানকারী, অহংকারীদের অপদস্থকারী, স্বেচ্ছাচারীদের নির্মূলকারী! আপনি আমাদের দুআ কবুল করে নিন। আমাদের ডাকে সাড়া দিন। হে আল্লাহ! আপনি নিশ্চয় জানেন, এ সকল ইংরেজ দখলদার আমাদের ভূমি দখল করে নিয়েছে, আমাদের অধিকার হরণ করেছে, এ দেশে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং এখানে বিশৃঙ্খলা বাড়িয়ে তুলেছে। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের ওপর তাদের ষড়যন্ত্রকে নস্যাৎ করে দিন, তাদের দম্ভ চূর্ণ করুন, তাদের সাম্রাজ্যের পতন ঘটান, আপনার ভূমি থেকে তাদের কর্তৃত্ব বিনাশ করুন। আপনি পাকড়াও করুন তাদেরকে, তাদের মিত্র, সহযোগী ও সহায়তাকারীদেরকে। আর আপনার পাকড়াও তো পরাক্রমশালী ও প্রবল ক্ষমতাধরের পাকড়াও। হে আল্লাহ! আপনার মুমিন বান্দাদের ওপর তাদের কোনো কর্তৃত্ব বাকি রাখবেন না।"

এ দুআটি ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জীবন ও অনুভূতিতে শুধু প্রান্তিক বিষয় হিসেবে থাকেনি; বরং বিষয়টি তাদের পূর্ণ চেতনা ও অনুভূতিকে স্পর্শ করেছে। এই দুআ তাদের ঘর ও মসজিদ, নির্জনতা ও সমাবেশ সকল জায়গায় তাদের সঙ্গী হয়েছে; এমনকি তাদের হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত হয়ে চেতনার অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত করেছে। এমনকি তারা এ দুআকে ছড়িয়ে দিয়েছে

www.bjilibrary.com

শহর-নগর-গ্রাম সবখানে। এ কারণে ইংরেজরা এ সকল মুসলিমের দ্বীনের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হওয়াকে যতটা ভয় করত, অন্য কোনো বিষয়কে এত ভয় করত না। তারা এ আশঙ্কাও করত যে, মুসলিমদের এই জাতীয় চেতনা ইসলামের ছোঁয়ায় স্ফুলিঙ্গে পরিণত হবে। ফলে দ্বীনের পথে তারা কোনো কিছুকে ভয় করবে না এবং তারা এ পরোয়াও করবে না যে, তারা কি মৃত্যুর সম্মুখীন হবে, না মৃত্যু তাদের সম্মুখীন হবে?

ইসলামি আন্দোলন এবং তার প্রতিষ্ঠাতার এই মজবুত প্রত্যয়ী অবস্থান সেক্যুলার সরকারের গভীর চক্রান্তের সম্মুখীন হয়। ১৯৪৮ সালে কানাত অঞ্চলে অবস্থিত ফায়েদ সামরিক ঘাঁটিতে ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতদের সম্মেলন উক্ত বিষয়টিকে প্রমাণ করে। সেখানে তারা মিশরের প্রধানমন্ত্রী নাকরাশি পাশার প্রশাসনের কাছে দাবি জানায়, ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়। আর এ ঘটনার পর যা হওয়ার তা-ই হয়েছিল।

এটি ছিল ইখওয়ানুল মুসলিমিনের 'ক্ষুদ্র অঞ্চল' তথা নীল উপত্যকা জুড়ে প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমের প্রতিক্রিয়া। তবে এই কঠিন পরিস্থিতি ও প্রতিবন্ধকতা ইখওয়ানকে তাদের 'বৃহৎ অঞ্চল' তথা বৃহৎ ইসলামি ভূখণ্ডের তৎপরতা হতে দমিয়ে রাখতে পারেনি। নিঃসন্দেহে ইখওয়ানের কর্মসূচিগুলোর মধ্য হতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ কর্মসূচি ছিল, নবি-রাসূলগণের পুণ্যভূমি, প্রথম কিবলা ফিলিস্তিন স্বাধীন করা– যেখানে মসজিদে আকসা অবস্থিত, যার মর্যাদা হারাম শরিফ ও মসজিদে নববির পরপরই। শুরু থেকেই ইখওয়ান বায়তুল মাকদাসের বিষয়ে ছিল তৎপর। ইখওয়ান এর মর্যাদার বিষয়ে খুবই গুরুত্বারোপ করেছে এবং এর তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে গণসচেতনতা সৃষ্টি করেছে। এ সম্পর্কে ইখওয়ান বিভিন্ন প্রচার-প্রচারণা চালিয়েছে এবং তাদের জার্নালে একাধিক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করেছে। এ ছাড়াও প্রতিবছর ২ নভেম্বর 'বেলফোর ঘোষণা'র দিনটিকে 'প্রতিবাদ দিবস' হিসেবে পালন করেছে। ফিলিস্তিনের সপক্ষে জনমত গঠন এবং মানবিক সংকট সম্পর্কে আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে তারা বড়ো বড়ো বিক্ষোভ মিছিল বের করেছে। ইখওয়ানের জার্নালের ত্রিশতম বর্ষের পুরাতন সংখ্যাগুলো পড়লে পাঠক এ সম্পর্কে অনেক বিস্ময়কর তথ্য জানতে পারবেন।

www.bjilibrary.com

ফিলিস্তিনের স্বাধীনতার বিষয়ে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের প্রতিটি সদস্যের স্পষ্ট ধারণা ছিল। তাদের অনুভূতি ও চেতনা ছিল এ বিষয়ে সদা জাগ্রত। অথচ তখনও মিশরের অধিকাংশ জনগণ এর তাৎপর্য এবং তাদের পার্শ্ববর্তী লোভী ও আগ্রাসী ইহুদিদের হিংস্রতা সম্পর্কে তেমন একটা অবগত ছিল না। এমনকি মিশরের প্রধানমন্ত্রী তো একদিন এক প্রশ্নের জবাবে বলেই ফেললেন যে, 'আমি তো মিশরের প্রধানমন্ত্রী; ফিলিস্তিনের প্রধানমন্ত্রী নই!'

এদিকে ফিলিস্তিন সম্পর্কে শহিদ ইমাম হাসান আল বান্নার জ্বালাময়ী বক্তব্য এবং ইখওয়ানের জার্নালে ও দৈনিক পত্রিকায় তাঁর ক্ষুরধার লেখনী সেই অবশ্যম্ভাবী দিবস সম্পর্কে উদ্‌বুদ্ধ করত, যার আগমনের ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই। এমনসব শব্দমালা তাঁর কণ্ঠে তখন সৃষ্ট হয়েছিল, যা পরিভাষা ও প্রবাদের রূপ পরিগ্রহ করে। যেমন– সিনাআতুল মাওত (মৃত্যুশিল্প), ফান্নুল মাওত (মৃত্যুর শৈল্পিকতা), হাব্বি ইয়া রিয়াহাল জান্নাহ (হে জান্নাতের সুবাতাস, তুমি প্রবাহিত হও) ইত্যাদি। অতঃপর বাস্তবেই এমন এক দিন এসে উপস্থিত হলো এবং একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিলো– 'জিহাদের জন্য এসো!' তখন এ সকল প্রশিক্ষণ ও কর্মশালা বাস্তব ফলদান শুরু করল। এরই ফলে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের হাজারো যুবক, এমনকি বৃদ্ধরাও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জিহাদের জন্য পবিত্র ভূমিতে এসে জড়ো হয়। রণাঙ্গণে তাদের বীরত্ব, শৌর্যবীর্য এবং আল্লাহর পথে শাহাদাতের তীব্র আকাঙ্ক্ষা যে কত বেশি ছিল, তা মুসলিমরা তো বটেই ইহুদিরাও ভালো করে উপলব্ধি করেছে।

পাশাপাশি ইখওয়ানুল মুসলিমিন পূর্ব আরবে সিরিয়া ও লেবাননের সমস্যা এবং উত্তর আফ্রিকা ও পশ্চিম আরব তথা তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া ও মারাকেশের সমস্যাবলির কথাও ভুলে যায়নি। এ সময় ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদরদপ্তর যেন এসব দেশের দায়িত্বশীল ও স্বাধীনতাকামী নেতৃবৃন্দের জন্য নিজের বাড়িতে পরিণত হয়েছিল।

এ ছাড়া ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দূরবর্তী মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে ইখওয়ানের তেমন উল্লেখযোগ্য দৃশ্যমান তৎপরতা দেখা না গেলেও ইখওয়ান সর্বদা সকল মুসলিমের সমস্যাগুলোকে নিজেদের সমস্যা মনে করত। শারীরিক দূরত্ব ও ভূ-অঞ্চলগত বৈচিত্র্য সত্ত্বেও চিন্তা ও চেতনায় তারা তাদের সাথে মিশে ছিল।

www.bjilibrary.com

দুই. ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা

ইমাম হাসান আল বান্নার রাজনৈতিক দর্শনের দ্বিতীয় ভিতটি হলো– ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জনগণের মনে অনুভূতি সৃষ্টি করা এবং তাদের মননে সুপ্ত ইসলামি চেতনাকে জাগ্রত করা। কেননা, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা একটি ফরজ বিধান; পাশাপাশি ইসলামি শাসনব্যবস্থা একটি জাতীয় ও মানবিক প্রয়োজনও।

এ দলিল হলো– আল্লাহ তায়ালা শাসক ও শাসিতের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা তাদের যাবতীয় সমস্যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিধান মেনে নেবে। এক্ষেত্রে তাদের অন্তর্নিহিত ঈমানের দাবিই হচ্ছে– আল্লাহর বিধানের বিকল্প কোনো কিছু বেছে নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

আল্লাহ তায়ালা শাসকদের লক্ষ করে বলেন–

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ﴿٤٥﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, নিশ্চয় তারা জালিম।" সূরা মায়িদা : ৪৫

...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿٤٧﴾

"যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান অনুযায়ী বিচার-ফয়সালা করে না, নিশ্চয় তারা ফাসিক।" সূরা মায়িদা : ৪৭

আর শাসিতের ব্যাপারে মহান আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ...﴿٣٦﴾

"আল্লাহ ও তাঁর রাসূল বিধান দেওয়ার পর কোনো মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর জন্য সে বিষয়ে ভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার নেই।" সূরা আহযাব : ৩৬

অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন–

اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا ۭ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿٥١﴾

www.bjilibrary.com

"নিশ্চয় মুমিনদের যখন আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে এ মর্মে আহ্বান করা হয় যে, তিনি তাদের মধ্যে নির্দেশ দেবেন, তখন তাদের বক্তব্য এই হয় যে, তারা বলে– 'আমরা শুনলাম ও আনুগত্য করলাম'; আর তারাই সফলকাম।" সূরা নূর : ৫১

আর এটি যে জাতীয় ও মানবিক প্রয়োজন, তার যুক্তি হলো– বিশেষভাবে মুসলিম উম্মাহ এবং সাধারণভাবে সমগ্র মানবতা মানবরচিত দর্শন ও জীবনব্যবস্থাগুলো পরখ করে দেখেছে। সেগুলো থেকে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে। কিন্তু মানবরচিত জীবনধারায় তারা পরম কাঙ্ক্ষিত সৌভাগ্য ও সুখময় জীবনের দিশা খুঁজে পায়নি; বরঞ্চ মানুষ তার ব্যক্তিজীবনের শান্তি ও স্বস্তি হারিয়েছে এবং পরিবারগুলো তাদের সুখ-শান্তি হারিয়ে হয়েছে বন্ধনহীন। আর সমাজ হারিয়েছে তার ঐক্য ও ভারসাম্য। সর্বোপরি পৃথিবী তার শান্তি ও নিরাপত্তা হারিয়েছে।

এ কারণে এখন মানবজাতির প্রয়োজন এমন এক মহৌষধ– যা মানবতার রোগব্যাধিগুলোর প্রতিকার করবে এবং নতুন করে কোনো ব্যাধি সৃষ্টি করবে না। এ যেন কবির সে কথারই বাস্তব প্রতিধ্বনি–

إذا استشفيت من داء بداء ** فاقتل ما أعلك ما شفاك

যদি তুমি একটি ব্যাধিকে আরেকটি ব্যাধির প্রতিষেধক মনে করো
তাহলে যেটিকে তুমি প্রতিষেধক মনে করেছ,
সেটিই তোমার জন্য বেশি প্রাণঘাতী প্রমাণিত হবে।

এ মহৌষধ ইসলাম ছাড়া ভিন্ন আর কিছু হতে পারে না। কারণ, মহান আল্লাহ তায়ালা ইসলামের মাঝেই দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় কল্যাণ সন্নিবেশিত করেছেন। তিনি ইসলামেই রেখেছেন মানবদেহ ও আত্মা উভয়টির চাহিদার যথেষ্ট জোগান। এই বিধানের মধ্যে বান্দার হক ও মহান আল্লাহর হকের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করেছেন এবং ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের কল্যাণ নিশ্চিত করেছেন। ইসলাম মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে স্বীয় বান্দাদের প্রতি ন্যায় ও ইনসাফের বিধান এবং আপন সৃষ্টির কল্যাণসাধনের নিমিত্তে ঐশী নির্দেশিকা। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۗ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿١٤﴾

"যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী, সম্যক অবগত।" সূরা মুলক : ১৪

www.bjilibrary.com

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর সকল পুস্তিকা ও বক্তব্যে এ মৌলিক বিষয়টির প্রতি জোর তাকিদ করেছেন যে, কুরআনের শাসন ও ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এর মাধ্যমে তিনি নবাগত ও অনিষ্টকর সেক্যুলারিজমের সাথে সংঘাতে জড়িয়ে পড়েন। সেক্যুলারিজমের মূলকথা হলো– রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা, আইন, শিক্ষা ও প্রচারমাধ্যম ইত্যাদির সাথে দ্বীনের কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

সেক্যুলারিজমের ধারণা খ্রিষ্টধর্মে বৈধ থাকলেও ইসলামে এর কোনো সুযোগ নেই। খ্রিষ্টধর্মে প্রবাদ আছে– 'কায়সারের সিদ্ধান্ত কায়সারকে নিতে দাও এবং ঈশ্বরের সিদ্ধান্ত ঈশ্বরকে নিতে দাও'।[৬] পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো– দ্বীন মানুষের জীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। দ্বীনকে জীবন থেকে পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই। বরং ইসলামের দৃষ্টিতে কায়সার, কায়সারের সাম্রাজ্য, সমগ্র মানুষ ও তাদের জীবনসহ সবকিছু পরাক্রমশালী এক আল্লাহর জন্য নিবেদিত ও অনুগত।

ইমাম শহিদ হাসান আল বান্না তাঁর إلى الشباب (হে যুবক) পুস্তিকায় বলেন–

> "আমরা এমন এক ইসলামি শাসন চাই, যা মানুষকে মসজিদমুখী করবে, ইসলামের জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত করবে। যেমনটি অনুপ্রাণিত করেছিল আল্লাহর রাসূল সা.-এর সাহাবি আবু বকর ও উমর রা.-এর শাসনামলে। আমরা এমন কোনো শাসনব্যবস্থা মানি না, যার ভিত্তি ইসলামের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং যা ইসলামের নির্দেশনার আলোকে প্রণীত নয়। অতএব, আমরা প্রচলিত রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে কখনও ঐকমত্য পোষণ করি না। কাফির ও ইসলামের শত্রুরা আমাদের ওপর যে শাসনব্যবস্থা চাপিয়ে দিয়েছে, তাও আমরা মানি না; বরং আমরা ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে তার সকল বৈশিষ্ট্যসহ পুনরুজ্জীবিত করতে চেষ্টা চালাব। এ মূলনীতির আলোকে আমরা ইসলামি শাসনব্যবস্থাকে সুসংহত করব।"

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের পঞ্চম সম্মেলনের বার্তায় (رسالة المؤتمر الخامس) এ বিষয়ে সুস্পষ্ট বিবৃতি প্রদান করা হয়। শাসনক্ষমতার ব্যাপারে ইখওয়ানের অবস্থান-সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর পর্বে শাইখ হাসান আল বান্না বলেন–

---

৬. এটিকে আরবিতে বলে– دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله; এবং ইংরেজিতে বলে– Leave what is Caesar's to Caesar and what is God's to God.

www.bjilibrary.com

"একদল লোক প্রশ্ন করে, ইখওয়ানের কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা কি এই যে– 'তারা নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠা করবে অথবা শাসনক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে? এক্ষেত্রে তাদের অবলম্বনই-বা কী?'

আমি এ বিষয়ে উত্তর প্রদানে কার্পণ্য করে প্রশ্নকারীদের দ্বিধাদ্বন্দ্বে রাখতে চাই না। মূলত ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের সকল পরিকল্পনা, প্রত্যাশা ও কার্যক্রমে ইসলামের সত্য ও সঠিক নির্দেশনার অনুসরণ করে।

ইখওয়ান ওই ইসলামে বিশ্বাস করে, যা শাসনক্ষমতাকে একটি মৌলিক স্তম্ভ হিসেবে গণ্য করেছে। ইসলাম যেমন বিধান প্রদান করে, তেমনি নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগে বিশ্বাস করে। এ সম্পর্কে ইসলামের তৃতীয় খলিফা আমিরুল মুমিনিন উসমান রা. বলেন–

إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

'নিশ্চয় আল্লাহ সুলতানের (শাসনক্ষমতার) মাধ্যমে এমন সব বিষয়কে নিয়ন্ত্রণ করেন, কেবল কুরআনের (উপদেশের) মাধ্যমে যেগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করেন না।'

রাসূল সা. শাসনক্ষমতাকে ইসলামের একটি অন্যতম অবলম্বন সাব্যস্ত করেছেন। এমনকি শাসনক্ষমতাকে আমাদের ফিকহের কিতাবগুলোতে আকিদাগত ও মৌলিক বিষয়সমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে; শাখাগত মাসয়ালা হিসেবে গণ্য করা হয়নি। ইসলাম যেমন শাসন ও নির্বাহী ক্ষমতায় বিশ্বাস করে, তেমনি বিধান প্রদান ও শিক্ষা দান করে। ইসলাম অনুরূপ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায়ও বিশ্বাস করে। এগুলোর একটিকে অপরটি থেকে পৃথক করার কোনো সুযোগ নেই। যদি কোনো সংস্কারক ফকিহ ও মুরশিদ হিসেবে দ্বীনি ইলম শিক্ষাদান কিংবা দ্বীনের মৌলিক ও শাখাগত মাসয়ালা বর্ণনাকেই নিজেদের জন্য যথেষ্ট মনে করেন কিংবা এতটুকুতেই আত্মতৃপ্তি অনুভব করেন, তাহলে এই সংস্কারকের আওয়াজ জনমানবহীন উপত্যকায় চিৎকার ও আগুনবিহীন ছাইয়ে ফুৎকারসদৃশ বিবেচিত হবে। কারণ, এভাবেই তারা শাসকশ্রেণি ও নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারীদের আল্লাহর দেওয়া বিধান ও তার নির্দেশনাবলির বিপরীত আইন প্রণয়ন করতে এবং সেসব মানবরচিত আইনে উম্মাহকে শাসন করার সুযোগ করে দেন।

www.bjilibrary.com

কখনও এমনটিও ঘটতে দেখা যায় যে, শাসকশ্রেণি আল্লাহর বিধানাবলির প্রতি মনোযোগ দেয়, সেগুলোর বাস্তবায়নে আগ্রহ দেখায় এবং আল্লাহ তায়ালার আয়াত, রাসূলের হাদিসসমূহের প্রচারের প্রতিও অনুরক্তি প্রদর্শন করে। এ দৃশ্য দেখে ইসলামি সংস্কারকগণ কিছু ওয়াজ-নসিহত ও দিক-নির্দেশনা প্রদান করেই আত্মতুষ্টি অনুভব করেন। অথচ বাস্তবতা হচ্ছে, এ অবস্থায়ও ইসলামি বিধান ও শাসন এক উপত্যকায় এবং তার বাস্তব প্রয়োগ আরেক উপত্যকায় অবস্থান করে। আর এ দুয়ের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব বহাল থেকে যায়। এ কারণে ইসলামি সংস্কারকদের ইসলামি শাসনের দাবি থেকে পিছিয়ে পড়া এমন অপরাধ, যার কাফফারা শুধু এটাই হতে পারে যে, তারা ওইসব লোকদের থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে তৎপর হবেন, যারা ইসলামি অনুশাসন পালন ও ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করতে রাজি নন।

এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। এর দ্বারা আমাদের ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধার করা উদ্দেশ্য নয়; বরং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে– পৃথিবীর বুকে যথার্থরূপে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা করা।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন মূলত নিজেদের জন্য শাসনক্ষমতা চায় না। যদি ইখওয়ান উম্মাহর মধ্যে এমন শাসকবর্গ খুঁজে পায়, যারা কুরআনের নির্দেশনা অনুসারে এই গুরুভার বহন ও আমানত আদায়ের জন্য প্রস্তুত, তাহলে ইখওয়ানুল মুসলিমিন হবে তাদের সহযোগী ও সহায়তাকারী। আর যদি এমন শাসকবর্গ খুঁজে পাওয়া না যায়, শাসনব্যবস্থা এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে ইখওয়ানুল মুসলিমিন ওই সকল লোক থেকে শাসনক্ষমতাকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে, যারা আল্লাহর বিধান বাস্তবায়ন করতে সচেষ্ট নয়।

সুতরাং ইখওয়ানুল মুসলিমিন বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার সাথে সামনে অগ্রসর হবে। বর্তমানে উম্মাহর মন-মননের যে নাজুক অবস্থা, সে অবস্থায় ইখওয়ান কখনোই আকস্মিকভাবে ক্ষমতায় যেতে চায় না; বরং শাসনক্ষমতায় যাওয়ার জন্য একটি অন্তর্বর্তী সময় আবশ্যক। এ সময়ে ইখওয়ানের নীতি ও আদর্শ মানুষের অন্তরে গেঁথে যাবে এবং এ জাতি শিখে যাবে– কীভাবে ক্ষুদ্র স্বার্থের ওপর বৃহৎ স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হয়।

www.bjilibrary.com

এখানে একটি কথা না বললেই নয়। আর তা হলো– ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দৃষ্টিতে বর্তমান সরকার কিংবা অতীতে যারা শাসনক্ষমতায় ছিল, এ ছাড়াও অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোতে এমন যোগ্য লোক নেই, যারা এ গুরুদায়িত্ব পালন করতে পারে কিংবা ইসলামি আন্দোলনকে বেগবান করতে যাদের সঠিক প্রস্তুতি রয়েছে। অতএব, এ মুহূর্তে উম্মাহর কর্তব্য হলো, ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা এবং শাসকবর্গের সমীপে নিজেদের ইসলামি অধিকারগুলো আদায়ের দাবি তোলা। ইখওয়ানুল মুসলিমিনও এজন্য কাজ করে যাবে।"

দ্বিতীয় কথাটি হচ্ছে, কিছু লোক মনে করে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন দাওয়াত প্রচারের একপর্যায়ে কোনো একটি সরকারের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছে অথবা নিজেদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বাইরে গিয়ে ভিন্ন কারও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করছে কিংবা নিজেদের কর্মপন্থা পরিহার করে ভিন্ন কারও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছে। যারা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্য এবং যারা সদস্য নন, তাদের সকলের অবগতির জন্য বলছি যে, এ ধরনের ধারণা-প্রচারণা অবান্তর ও সম্পূর্ণ অমূলক।"

ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানের পঞ্চম সম্মেলনের বার্তায় সামরিক শক্তির ব্যবহার কিংবা গণ-আন্দোলন ও জাতিগত বিদ্রোহের বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান ব্যক্ত করতে ভোলেননি। তিনি বলেন–

"অনেকে প্রশ্ন করেন, ইখওয়ানুল মুসলিমিনের লক্ষ্য অর্জন ও উদ্দেশ্য সাধনে সামরিক শক্তি ব্যবহারের কোনো পরিকল্পনা বা সংকল্প আছে কি-না? ইখওয়ানুল মুসলিমিন মিশরের রাষ্ট্রব্যবস্থা ও সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে কোনো গণ-আন্দোলন কিংবা বিদ্রোহ গড়ে তোলার চিন্তা করছে কি-না?

আমি এ সকল প্রশ্নকারীকেও দ্বিধায় রাখতে চাই না; বরং আমি তাদের প্রশ্নের কারণে এ বিষয়ে কথা বলার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে সুস্পষ্ট ভাষায় এবং দ্ব্যর্থহীনভাবে এর উত্তর দিতে চাই। আগ্রহী ব্যক্তিগণ যেন আমার এ বক্তব্য জেনে নেয়।

ইসলামি শাসনব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তিমত্তা ইসলামের একটি অনন্য প্রতীক। এ কারণে পবিত্র কুরআন দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করছে–

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَ عَدُوَّكُمْ...﴿٦٠﴾

www.bjilibrary.com

'তোমরা তাদের মোকাবিলার জন্য তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত করো। এর দ্বারা তোমরা ভয় দেখাবে আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে।' সূরা আনফাল : ৬০

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন–

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ، خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ

'আল্লাহর নিকট শক্তিশালী মুমিন, দুর্বল মুমিন থেকে অধিক প্রিয় ও উত্তম।' মুসলিম : ২৬৬৪

এমনকি দুআ ও মুনাজাত– যা নিজের অসহায়ত্ব প্রকাশ এবং কাকুতি-মিনতির জায়গা, সেখানেও শক্তিমত্তাকে ইসলামের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দেখুন, নবিজি সা. নিজের ব্যক্তিগত মুনাজাতে কীভাবে দুআ করতেন, যে দুআ তিনি স্বীয় উম্মতকেও শিখিয়েছেন–

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَقَهْرِ الرِّجَالِ.

'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় কামনা করছি দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতা থেকে। আরও আশ্রয় কামনা করছি অক্ষমতা ও অলসতা থেকে। আমি আশ্রয় চাইছি ভীরুতা ও কৃপণতা থেকে। আমি আশ্রয় চাইছি ঋণের বোঝা ও মানুষের নির্দয়তা থেকে।' আবু দাউদ : ১৫৫৫

এ দুআর মধ্যে আপনি লক্ষ করে দেখবেন, নবিজি সা. দুর্বলতার সকল উপকরণ ও বৈশিষ্ট্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। যেমন– ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা সৃষ্টি হয় দুশ্চিন্তা ও বিষণ্নতার দ্বারা। সৃষ্টিশীলতার দুর্বলতা আসে অক্ষমতা ও অলসতার দ্বারা। সম্পদ ব্যয় ও আর্থিক দুর্বলতা আসে ভীরুতা ও কৃপণতার দ্বারা। মানমর্যাদা কমে যায় মাথার ওপর ঋণের বোঝা থাকলে এবং মানুষের নির্দয় আচরণের শিকার হলে। অতএব, আপনি কি এ আশা করেন না, যে ব্যক্তি এ দ্বীনের অনুসারী হবে, সে সকল ক্ষেত্রে শক্তিশালী হবে? প্রতিটি ক্ষেত্রে শক্তিমত্তা হবে তার অনন্য বৈশিষ্ট্য? অতএব, ইখওয়ানুল মুসলিমিন অবশ্যই শক্তি অর্জন করবে এবং দৃঢ়তার সাথে সামনে এগিয়ে যাবে।

www.bjilibrary.com

তবে এক্ষেত্রে ইখওয়ানুল মুসলিমিন গভীর চিন্তা ও দূরদর্শিতার সাথে কাজ করবে, যেন ভুল চিন্তা-ভাবনা ও অপরিণামদর্শিতার কারণে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়। এ কারণে ইখওয়ান মনে করে– শক্তিমত্তার সর্বপ্রথম স্তর হচ্ছে, ঈমান ও বিশ্বাসের শক্তি। এর সাথে রয়েছে ঐক্য ও সংহতির শক্তি। এরপর হলো বাহুবল ও সামরিক শক্তি। অতএব, এ সকল বিষয়ের পর্যাপ্ত মজুদ না থাকলে কোনো দলকে শক্তিশালী আখ্যা দেওয়া যায় না। তাই কোনো দল যদি বাহুবল ও সামরিক শক্তির ব্যবহার ঘটায়, কিন্তু তাদের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা না থাকে অথবা দুর্বল বিশ্বাস ও ক্ষীণকায় ঈমানের অধিকারী হয়, তাহলে তার ধ্বংস ও বিনাশ অনিবার্য। এটি এ বিষয়ে প্রথম দৃষ্টিকোণ।

দ্বিতীয় দৃষ্টিকোণ হলো, ইসলাম –যার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো শক্তিমত্তা– সকল পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে সামরিক শক্তি প্রয়োগের নির্দেশ দিয়েছে কি? নাকি তার জন্য কোনো শর্ত ও সীমারেখা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে? এবং শক্তি প্রয়োগের জন্য প্রয়োগক্ষেত্র নির্ধারণ করে দিয়েছে?

তৃতীয় দৃষ্টিকোণ হলো, শক্তি প্রয়োগ কি তার চিকিৎসার প্রথম ধাপ, নাকি শেষ ধাপ ও সর্বশেষ অবলম্বন?

অনুরূপ শক্তি প্রয়োগের পূর্বে এ চিন্তা-ভাবনা আবশ্যক কি-না যে, এর ফলাফল কতটুকু ইতিবাচক বা নেতিবাচক হবে? এবং তার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে কি-না? নাকি পরিণামের চিন্তা না করেই শক্তির প্রয়োগ ঘটাবে এবং তার পরে যা হওয়ার হবে?

ইখওয়ানুল মুসলিমিন সামরিক শক্তি প্রয়োগের পূর্বে তার নীতিমালার অনুসরণে এ বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ রাখে। আর বিদ্রোহ হচ্ছে শক্তি প্রয়োগের একটি চূড়ান্ত ধাপ। এ ব্যাপারে ইখওয়ানের দৃষ্টি গভীর ও সূক্ষ্মতর। বিশেষ করে মিশরের মতো একটি দেশে, যার ঝুলিতে বহু বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের শিকার হওয়ার অভিজ্ঞতা রয়েছে। কিন্তু এর ফলাফল কী দাঁড়িয়েছে, তা আপনাদের অজানা নয়। এ সকল বিষয়ের উপযোগিতা ও তার মূল্যায়নের পর আমি বলব– ইখওয়ানুল মুসলিমিন তার কার্যত শক্তির প্রয়োগ ঘটাবে তখন, যখন তা ছাড়া কোনো উপায়ান্তর না থাকবে এবং যখন তারা নিজেদের ব্যাপারে এতটুকু আস্থা অর্জন করবে যে, তারা ঈমান মজবুতকরণ ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার ধাপগুলোতে কাঙ্ক্ষিত মান

www.bjilibrary.com

অর্জন করেছে। এ পর্যায়ে এসে সামরিক শক্তির প্রয়োগ ঘটালে ইখওয়ান হবে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী। প্রথমে তারা প্রতিপক্ষকে সতর্ক করবে, এরপর অপেক্ষা করবে। অতঃপর সম্মান ও বিজয়ের পথে অগ্রসর হবে। সবশেষে এ প্রচেষ্টার ফলাফল প্রফুল্লচিত্তে মেনে নেবে।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রথমেই বিদ্রোহের চিন্তা করে না, তাতে নির্ভর করে না এবং তার লাভ ও ফলাফলে বিশ্বাসও করে না। যদিও ইখওয়ান মিশরের প্রত্যেক সরকারকে এ কথা স্পষ্টরূপে জানিয়ে দিয়েছে যে, যদি পরিস্থিতি এভাবেই চলতে থাকে এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বশীলগণ সমস্যার সমাধানে দ্রুত সংস্কারকাজ ও আশু পদক্ষেপ গ্রহণ না করে, তাহলে অনিবার্যরূপে বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে। তবে তা ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কার্যক্রম বা তাদের দাওয়াতের কারণে নয়; বরং তা হবে সময়ের দাবি ও পরিস্থিতির চাহিদা অনুযায়ী এবং সংস্কারের সুযোগগুলোকে বিনষ্ট করার কারণে। আর পরিস্থিতি এই যে, সমস্যাগুলো ক্রমেই জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে এবং তীব্র আকার ধারণ করছে। এসব হলো আগাম সতর্কবার্তা। কাজেই রাষ্ট্রের দায়িত্বশীলদের এ ব্যাপারে দ্রুতই তৎপর হওয়া উচিত।"

তিন. ইসলামের জন্য ঐক্য

ইসলামি ঐক্যের আবশ্যকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি ও অনুভূতিকে জাগ্রত করা। কারণ, এটি একটি দ্বীনি ফরজ বিধান এবং দুনিয়াবি প্রয়োজনও বটে।

এর ফরজ হওয়ার প্রমাণ হলো, মহান আল্লাহ সকল মুসলিমকে এক জাতি বলে ঘোষণা করেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন–

﴿وَإِنَّ هٰذِهٖٓ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَّاحِدَةً وَّأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ ﴿٥٢﴾﴾

"তোমাদের এই যে জাতি, সে তো একটি জাতিই। আর আমিই তোমাদের রব। কাজেই আমাকে ভয় করো।" সূরা মুমিনুন : ৫২

আর হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূল সা. বলেছেন–

الْمُؤْمِنُوْنَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

www.bjilibrary.com

"মুমিনদের জীবনের মূল্য সমান। তারা বিধর্মীদের বিরুদ্ধে এক হাতের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং তাদের মধ্য হতে সবচেয়ে সাধারণ ব্যক্তিও প্রতিপক্ষকে নিরাপত্তা দিতে পারবে।" আহমাদ : ৯৯১

ইসলাম মুসলিমদের ওপর এ বিষয়টি আবশ্যক করেছে যে, তারা যেখানেই থাকুক এবং তাদের সাম্রাজ্য যতদূরই বিস্তৃত হোক, তাদের সকলের একজন খলিফা ও রাষ্ট্রপ্রধান থাকবে– যিনি হবেন তাদের ঐক্যের প্রতীক। এ কারণে হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.

"যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল যে– সে বাইয়াত করেনি, তাহলে সে জাহিলিয়াতের ওপর মৃত্যুবরণ করল।" মুসলিম : ১৮৫১

এই ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আমাদের সবার জানা আছে। কেননা, আমরা জানি– একতাই বল এবং অনৈক্যই হচ্ছে দুর্বলতার ভিত্তি। যেমন, একটি কাঁচা ইট এককভাবে দুর্বল। কিন্তু ইটের সাথে ইটের গাঁথুনিতে এমন মজবুত প্রাচীর তৈরি হয়– যা ধসিয়ে দেওয়া বা তার কোনোরূপ ক্ষতি করা কঠিন হয়ে যায়।

এ কারণে আমরা শহিদ ইমাম হাসান আল বান্নাকে দেখেছি– তিনি মানুষের মধ্যে ইসলামি খিলাফত পুনরুদ্ধারের প্রেরণা জাগ্রত করছেন। তিনি এ বিষয়টিকে জোরালো করতে, ইখওয়ানের সদস্যদের হৃদয় ও মনে বদ্ধমূল করতে সম্ভাব্য সকল সুযোগকে কাজে লাগাতেন– যাতে এ চেতনা নিয়েই শিশুরা বেড়ে উঠে এবং যুবকরা বার্ধক্যে উপনীত হয়।

ইমাম বান্না ঐক্যের সঠিক অর্থ অনুধাবন এবং তার যথোপযুক্ত প্রয়োগ করতেন। তিনি ইসলামি ঐক্য, জাতীয় ঐক্য এবং আরব ঐক্যকে পরিপূরক হিসেবে উপস্থাপন করতেন।

'পঞ্চম সম্মেলনের বার্তা'য় আমি মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম– ইমাম বান্না জাতীয়, আরব ও ইসলামি ঐক্যের মধ্যকার বৈচিত্র্য ও স্তরগুলো সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এবং ইখওয়ানের অবস্থান আলোচনা করছিলেন। সে আলোচনায় তিনি বলেন–

"ইসলাম ঐক্যের বিষয়টিকে ফরজ হিসেবে আবশ্যক করেছে– যাকে উপেক্ষা করার কোনো সুযোগ নেই। তাই প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য হলো,

www.bjilibrary.com

সে তার দেশের কল্যাণে ও সেবায় নিবেদিতপ্রাণ হয়ে কাজ করবে। যে জাতির মধ্যে তার বসবাস, সে জাতির কল্যাণে নিজের সাধ্যের সর্বোচ্চটুকু বিলিয়ে দেবে। এক্ষেত্রে রক্তের সম্পর্কের আত্মীয় ও প্রতিবেশীদের অগ্রাধিকার দেবে। মূলত এ কারণে একান্ত প্রয়োজন ছাড়া সফরের দূরত্বের বাইরে সম্পদের যাকাত স্থানান্তর করার বৈধতা দেওয়া হয়নি; যাতে নিকটাত্মীয়রা তার সম্পদ দ্বারা আগে উপকৃত হতে পারে। তাই প্রত্যেক মুসলিমের কতর্ব্য হলো, সে যে সমাজে বাস করে, সে সমাজের অভাব আগে মোচন করবে। যে দেশের আলো-বাতাসে সে বেড়ে উঠেছে, আগে সে দেশের সেবা করবে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে একজন মুসলিমের মধ্যে দেশপ্রেম সবচেয়ে বেশি থাকবে এবং দেশবাসীর কল্যাণে সে-ই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে। কারণ, বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে এ জনপদটি তার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তাই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের মধ্যে দেশপ্রেম সবচেয়ে বেশি এবং দেশের মানুষের সেবায় তারাই সবচেয়ে বেশি নিবেদিতপ্রাণ। এজন্য ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা প্রিয় স্বদেশের সম্মান ও মর্যাদা আশা করে এবং তার উন্নয়ন, সমৃদ্ধি ও সফলতার জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করে। উপরন্তু পারিপার্শ্বিক বিভিন্ন অবস্থা ও ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে মুসলিম উম্মাহর নেতৃত্ব এখন এই দেশটির হাতে এসে সমর্পিত হয়েছে।

এ ব্যাপারে কারও কোনো সন্দেহ নেই যে, ইসলামের সূচনা হয়েছে আরবে এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিস্তারও ঘটেছে এই আরবদের মাধ্যমেই। ইসলামের মহিমান্বিত গ্রন্থ আল-কুরআনও বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় নাযিল হয়েছে। আর যেদিন মুসলিমরা মনেপ্রাণে ইসলামকে আপন করে নিয়েছে, এরই সুবাদে সকল জাতি ও গোষ্ঠী এই ভাষায় একতাবদ্ধ হয়েছে। এ কারণে বলা হয়ে থাকে–

اذا ذل العرب ذل الإسلام.

'আরবদের অবমাননা, সে তো ইসলামেরই অবমাননা।'

এ কথা সেদিনই বাস্তব প্রমাণিত হয়েছে, যেদিন রাজনৈতিক নেতৃত্ব আরবদের হাত থেকে ছুটে গিয়ে দায়লাম ও অন্যান্য অনারবদের হাতে স্থানান্তরিত হয়েছে। আরবরা হলো ইসলামের প্রধান শক্তি ও প্রহরী। অতএব, ইসলামের হৃত সম্মান পুনরুদ্ধার, সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ও নেতৃত্বের অবস্থান তৈরির জন্য তাদের ঐক্যের কোনো বিকল্প নেই।

www.bjilibrary.com

বাকি রইল ইসলামি ঐক্যের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান নির্দিষ্ট করার বিষয়টি। প্রকৃত কথা হচ্ছে– ইসলামে যেমন আকিদা ও ইবাদত রয়েছে, তেমনি তাতে দেশপ্রেম ও স্বজাতির প্রতি স্বাভাবিক দরদের বিষয়ও রয়েছে। ইসলাম বংশ ও বর্ণগত সকল পার্থক্য ঘুচিয়ে সকল মানুষকে এককাতারে দাঁড় করিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ.

'নিশ্চয় মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।' সূরা হুজুরাত : ১০

আল্লাহর রাসূল সা. বলেন–

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ

'এক মুসলিম অপর মুসলেমের ভাই।' বুখারি : ২৪৪২

الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ. وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ.

"মুমিনদের জীবনের মূল্য সমান। তারা শত্রুদের বিরুদ্ধে এক হাতের মতো ঐক্যবদ্ধ শক্তি এবং তাদের মধ্যকার সবচে সাধারণ ব্যক্তিও প্রতিপক্ষকে নিরাপত্তা দিতে পারবে।" আহমাদ : ৯৯১

বর্তমান মুসলিম বিশ্বের যে ভৌগোলিক সীমারেখা আমরা নির্ধারণ করেছি, এটিও ইসলাম-সমর্থিত নয়। অনুরূপ জাতিগত বিভেদ ও বর্ণবৈষম্যও ইসলাম সমর্থন করে না; বরং ইসলাম সমগ্র বিশ্বের মুসলিমদের এক জাতি হিসেবে বিবেচনা করে। সেইসাথে সমগ্র মুসলিম দেশগুলোকে একটি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করে; যদিও সেগুলোর মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব ও সীমানাগত পার্থক্য বিদ্যমান। ইখওয়ানুল মুসলিমিন এই ঐক্যকে শ্রদ্ধাভরে সমর্থন করে এবং এই একতায় দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে। সেইসাথে ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে জোরালো করে মুসলিমদের এক পতাকাতলে সমবেত করার জন্যও কাজ করে। ইখওয়ানের কথা হলো– 'পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যে ভূখণ্ডের বুকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলার মতো একজন মুসলিমও রয়েছে, সেই ভূখণ্ড তাদের দেশ।"

মুসলিমদের ঐক্যের ব্যাপারে যারা নিরাশ হয়ে গেছে এবং যারা মানুষের মাঝে হতাশা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছে, তারা বলে– 'উম্মাহর ঐক্য একটি অসম্ভব

www.bjilibrary.com

বিষয়। এর জন্য কাজ করা ব্যর্থ চেষ্টা এবং পণ্ডশ্রম ছাড়া কিছুই নয়। যারা এই ঐক্যের জন্য কাজ করছে, তাদের জন্য এটাই শ্রেয় যে, তারা স্বজাতির জন্য কাজ কাজ করবে এবং নিজ দেশ ও মাতৃভূমির সেবায় নিয়োজিত হবে।'

ইমাম হাসান আল বান্না তাদের এ কথার জবাবে বলছেন–

"এটি হলো দুর্বলতা ও অসহায়ত্বের ভাষা। মুসলিম উম্মাহ ইতঃপূর্বেও বহু দলে বিভক্ত ছিল। মতাদর্শ, ভাষা, আবেগ-অনুভূতি, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে তাদের মধ্যে বিরোধ আগেও হয়েছে। কিন্তু ইসলাম তাদের সকলকে এক করে একটি কালিমায় তাদের অন্তরসমূহকে গেঁথে দিয়েছে। ইসলামের সেই সীমারেখা ও নীতিমালা আজও বর্তমান। কাজেই ইসলামে যদি কোনো সূর্যসন্তানের আগমন হয়, যে দাওয়াতের এ গুরুদায়িত্ব বহন করবে এবং মানুষের অন্তরে নতুন করে বার্তা পৌঁছে দেবে, তাহলে ইসলাম পুনরায় সকল জাতিগোষ্ঠীকে এমনভাবে ঐক্যবদ্ধ করবে, যেমনটি পূর্বে করেছিল। কারণ, পুনরাবৃত্তি তো নতুন কিছুর সূচনা থেকে সহজতর এবং পূর্ব অভিজ্ঞতা তো প্রমাণ হিসেবে উৎকৃষ্টতর।

সুতরাং এ কথা স্পষ্ট যে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন কাঙ্ক্ষিত ঐক্যের ভিত্তিমূল হিসেবে উম্মাহ-চেতনাকে জোরালোভাবে সম্মান করে। সেইসাথে ইখওয়ান এতে কোনো সমস্যা মনে করে না যে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ দেশের কল্যাণে কাজ করবে এবং সেই কাজকে প্রাধান্য দেবে। অতঃপর বিপ্লবের দ্বিতীয় ধাপ হিসেবে আরব ঐক্যকে সমর্থন করবে। পাশাপাশি তৃতীয় ধাপে বৃহৎ ইসলামি ভূখণ্ড গঠনের লক্ষ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের জন্য কাজ করবে।

উপর্যুক্ত বক্তব্যের পর আমি বলব, ইখওয়ানুল মুসলিমিন সমগ্র বিশ্বের জন্য কল্যাণ কামনা করে। ইখওয়ান বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের আহ্বান জানায়। কেননা, এটিই ইসলামের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য এবং আল্লাহ তায়ালার এ বাণীর দাবি–

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ.

"(হে নবি!) আমি তো আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমতস্বরূপ পাঠিয়েছি।" সূরা আম্বিয়া : ১০৭

www.bjilibrary.com

উপর্যুক্ত আলোচনার পর এ কথার বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এই দৃষ্টিকোণ থেকে উল্লিখিত ঐক্যের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে পরস্পর কোনো বৈপরীত্য নেই; বরং একটি অপরটির সহায়ক ও পরিপূরক। কিন্তু কোনো সম্প্রদায় যদি নিজস্ব জাতীয়তাবাদের প্রতি আহ্বান করে এবং এটিকে বৃহৎ ঐক্যের অনুভূতি শেষ করে দেওয়ার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে, তবে ইখওয়ানুল মুসলিমিন তাদের সাথে নেই। সম্ভবত এটি ইখওয়ান ও অন্য অনেক দলের মধ্যে একটি অন্যতম পার্থক্য।

এ আলোচনার পরিপূরক হিসেবে আমি ইসলামি খিলাফত সম্পর্কে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের অবস্থান স্পষ্ট করা সংগত মনে করছি। ইখওয়ান মনে করে, খিলাফতব্যবস্থা হলো ইসলামি ঐক্যের অন্যতম নিদর্শন ও প্রতীক এবং মুসলিম জাতিসমূহের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশ। সেইসাথে এটি ইসলামের একটি আবশ্যিক বিধান যে, মুসলিমদের এ বিষয়ে চিন্তা করা এবং খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা ওয়াজিব। কারণ, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অনেক বিষয় এমন আছে– যা খলিফার সাথে সম্পৃক্ত। এ গুরুত্বের কথা বিবেচনা করেই সাহাবায়ে কিরাম নবিজি সা.-এর কাফন ও দাফন সম্পন্ন করার পূর্বেই খিলাফতের বিষয়টিকে সমাধা করতে উদ্যোগী হয়েছেন এবং খলিফা নির্ধারণ চূড়ান্ত করার পরই কাফন-দাফনের কাজ সম্পন্ন করেছেন।

মুসলিমদের জন্য একজন ইমাম বা রাষ্ট্রপ্রধানের আবশ্যকতা এবং খিলাফত ও তৎসংশ্লিষ্ট বিধিবিধান সম্পর্কিত হাদিসসমূহ পর্যালোচনা করলে এ কথা সুস্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা করা মুসলিমদের ওপর একটি আবশ্যকীয় বিধান। যখন থেকে ইসলামি খিলাফতব্যবস্থায় বিকৃতি সাধিত হয়েছে, তখন থেকে আজ অবধি এ বিধান পূর্বের ন্যায় বলবৎ রয়েছে। এ কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিন খিলাফতের বিষয়ে চিন্তা করা এবং তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে যাওয়াকে তাদের কর্মসূচির প্রধান অংশ হিসেবে স্থির করেছে। সেইসাথে ইখওয়ান বিশ্বাস করে, খিলাফত-প্রতিষ্ঠার জন্য অনেক পূর্বপ্রস্তুতি রয়েছে। তাই খিলাফত পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সরাসরি পদক্ষেপ গ্রহণের পূর্বে আরও বহু কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।"

এ সবকিছু হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারার কিছু অংশ। প্রচলিত রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের সাথে ইখওয়ানের সামান্য কিছু বিষয়ে মিল থাকলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের সাথে বিরোধ ও বৈপরীত্য রয়েছে।

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানদের যে তালিম ও তারবিয়াত প্রদান করা হয়, তা হচ্ছে বিশুদ্ধ ইসলামি শিক্ষা। কারণ, তার উপাদান ও সারবস্তু কেবল ইসলামের স্বচ্ছ ঝরনা থেকে আহরিত হয়েছে। তাই ইখওয়ান অত্যন্ত সচেতনতার সাথে ইতিবাচক শিক্ষা প্রদান করে। ইখওয়ানুল মুসলিমিন উত্তেজনা সৃষ্টি নয়, অনুধাবনে বিশ্বাসী; কথায় নয়, কাজে বিশ্বাসী; ধ্বংসযজ্ঞে নয়, নির্মাণে বিশ্বাসী; কল্পনায় নয়, বাস্তবতায় বিশ্বাসী; ভোগবাদ ও প্রবৃত্তির অনুসরণে নয়, বরং ত্যাগ-কুরবানি ও পরোপকারে বিশ্বাসী।[৭]

***

৭. ইখওয়ানুল মুসলিমিনের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও ইমাম বান্নার রাজনৈতিক তারবিয়াত সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে– التربية السياسية عند الإمام حسن البنا বইটি সহায়ক হবে। বইটির বাংলা অনুবাদ শীঘ্রই প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে 'ইমাম হাসান আল বান্নার রাজনৈতিক চিন্তাধারা' নামে প্রকাশিত হবে, ইনশাআল্লাহ। –সম্পাদক

www.bjilibrary.com

তৃতীয় অধ্যায়

ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনমূলক কর্মতৎপরতা

ইখওয়ানের তালিম-তারবিয়াতের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– রাব্বানিয়্যাত বা ঈমানের মজবুতির প্রতি যথাযথ গুরুত্বারোপ এবং শিক্ষা-প্রশিক্ষণে ইসলামের ব্যাপকতার সকল দিকের অন্তর্ভুক্তি। অনুরূপ এর আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে– ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি ও গঠনমূলক কর্মতৎপরতা।

এই আন্দোলনের স্বপ্নদ্রষ্টা ও আহ্বায়ক হাসান আল বান্নার কাজে তাঁর নামের যথার্থ প্রয়োগ ঘটেছিল। আরবিতে বান্না শব্দের অর্থ হলো– নির্মাতা। বাস্তবিক অর্থেই তিনি ছিলেন সংগঠক ও নির্মাতা। তিনি ছিলেন কাজের মানুষ; অহেতুক কথক নন। তিনি ছিলেন বাস্তবদর্শী; অলীক কল্পনাবিলাসী নন। এ কারণে ইমাম বান্না নিজের এবং তাঁর সহযোগী ইখওয়ান সদস্যদের শক্তি-সামর্থ্য দ্বারা ইতিবাচক মানসিকতা ও সৃষ্টিশীল চিন্তার প্রসার ঘটাতে চেয়েছেন। সেইসাথে তিনি চেয়েছেন, তাঁর সংগঠন ও সহকর্মীরা যেন অযথা বাগাড়ম্বর, নিরর্থক কথা, শিশুদের মতো অবুঝ কাজকর্ম ও অন্যের দোষান্বেষণ ইত্যাদি নেতিবাচকতা থেকে নিবৃত্ত থাকে। কেননা, সৌভাগ্যবান তো ওই ব্যক্তি– যাকে নিজের দোষের চিন্তা অন্যদের দোষান্বেষণ থেকে বিমুখ করে রাখে।

একজন মুসলিমের প্রতি ইসলামের দাবি হলো– সে কথায় নয়; কাজে বিশ্বাসী হবে। যে কথা বলবে, তা শুধু কাজের জন্যই বলবে। আর যে কাজ করবে, তা সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে, যেন আল্লাহর এ ভর্ৎসনার সম্মুখীন হতে না হয়–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٢﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُوا۟ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٣﴾

"হে মুমিনগণ! তোমরা যা করো না, তা কেন বলো? তোমরা নিজেরা যা করো না, তা অন্যকে বলা আল্লাহর দৃষ্টিতে খুবই অসন্তোষজনক।" সূরা সফ : ২-৩

www.bjilibrary.com

তাই একজন প্রকৃত মুসলিমের কাজ কখনও নিরর্থক ও নিষ্ফল হতে পারে না। বরং তা হতে হবে মহান আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য এবং সুরুচিসম্পন্ন মানুষদের কাছেও স্বীকৃত ও মূল্যবান। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقُلِ اعْمَلُوْا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ۖ وَسَتُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ﴿١٠٥﴾

"(হে নবি!) বলে দিন– তোমরা কাজ করতে থাকো। অচিরেই আল্লাহ তায়ালা তোমাদের কাজের প্রতি মনোনিবেশ করবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও তা দেখবেন। আর শীঘ্রই তোমাদের প্রত্যাবর্তিত করা হবে অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। অতঃপর তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা করেছিলে, তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।" সূরা তাওবা : ১০৫

ইসলাম এটাকে সমর্থন করে না যে, কোনো মুসলিম উদ্দেশ্যহীন কাজে পড়ে থাকবে অথবা নিরর্থক কাজে ব্যস্ত হবে কিংবা অন্যায় কথা ও কাজে লিপ্ত হবে অথবা অন্যায় আচরণের জবাবে অনুরূপ অন্যায় আচরণ করবে। এ কারণে কুরআন মাজিদে আল্লাহ তায়ালা অনর্থক কথা-কাজ পরিহার করাকে মুমিনদের প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহপাক বলেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ﴿٣﴾

"মুমিনরা অসার কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে।" সূরা মুমিনুন : ৩

وَاِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ اَعْرَضُوْا عَنْهُ وَقَالُوْا لَنَآ اَعْمَالُنَا وَلَكُمْ اَعْمَالُكُمْ ۖ سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ ۖ لَا نَبْتَغِى الْجٰهِلِيْنَ ﴿٥٥﴾

"তারা (মুমিনরা) যখন অহেতুক কথাবার্তা শোনে, তখন তারা তা উপেক্ষা করে এবং বলে– আমাদের কাজের ফল আমরা ভোগ করব এবং তোমাদের কাজের ফল তোমরা ভোগ করবে। তোমাদের প্রতি সালাম। আমরা অজ্ঞদের সাথে জড়াতে চাই না।" সূরা কাসাস : ৫৫

আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্পর্কে বলেন–

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾

www.bjilibrary.com

"রহমানের বান্দা তো তারাই, যারা জমিনে নম্রভাবে চলাফেরা করে এবং তাদেরকে যখন অজ্ঞ লোকেরা (অশালীন ভাষায়) সম্বোধন করে, তখন তারা বলে– 'সালাম'।" সূরা ফুরকান : ৬৩

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾

"তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না এবং অনর্থক ক্রিয়াকলাপের সম্মুখীন হলে তা ভদ্রতার সাথে পরিহার করে চলে।" সূরা ফুরকান : ৭২

হাদিস শরিফে বর্ণিত হয়েছে–

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ.

"ব্যক্তির ইসলামের সৌন্দর্য হলো– অনর্থক কাজ পরিহার করে চলা।" তিরমিযি : ২৩১৭

ইসলাম এ কাজকে খুব বেশি অপছন্দ করে যে, কোনো ব্যক্তি তার অন্তর ও জিহ্বাকে মানুষ কিংবা কোনো জিনিসের প্রতি গালমন্দ করা বা অভিসম্পাতের জন্য ব্যবহার করবে। কারণ, গালমন্দ করা বা অভিসম্পাত করা মুসলিমের বৈশিষ্ট্য নয়। এ কারণে রাসূলে কারিম সা. থেকে বহু হাদিস বর্ণিত হয়েছে, যেখানে গালমন্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন, তিনি বলেছেন–

لَا تَسُبُّوا الْأَمْوَاتَ، فَإِنَّهُمْ قَدْ أَفْضَوْا إِلَى مَا قَدَّمُوا.

"তোমরা মৃতদের গালমন্দ করো না। কেননা, তারা যে আমল করে পাঠিয়েছে, ইতোমধ্যে তার কাছে পৌঁছে গেছে।" বুখারি : ১৩৯৩

لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ، فَإِنَّ اللهَ هُوَ الدَّهْرُ.

"তোমরা সময়কে গালি দিয়ো না। কেননা, আল্লাহ তায়ালাই সময়ের নিয়ন্ত্রণকারী।" মুসলিম : ২২৪৬

لَا تَلْعَنِ الرِّيحَ فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ.

"বাতাসকে গালি দিয়ো না। কেননা, সে আদিষ্ট।" তিরমিযি : ১৯৭৮

لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ.

"জ্বরকে গালি দিয়ো না। কেননা, তা আদম সন্তানের পাপ মোচন করে, যেভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে।" মুসলিম : ২৫৭৫

www.bjilibrary.com

لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ فَإِنَّهُ يُوقِظُ لِلصَّلَاةِ.

"তোমরা মোরগকে গালি দিয়ো না। কেননা, তা নামাজের জন্য জাগ্রত করে।" আবু দাউদ : ৫১০১

আরও অবাক করা বিষয় হলো– হাদিস শরিফে স্বয়ং শয়তানকে পর্যন্ত গালমন্দ করতে নিষেধ করা হয়েছে; অথচ শয়তান মানুষের চিরশত্রু এবং আল্লাহর রহমত থেকে ধিক্কৃত ও বিতাড়িত হয়েছে। ইমাম নাসায়ি, তাবারানি ও হাকিম এক সাহাবি থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন– আমি একদিন উটের পিঠে নবি সা.-এর পেছনে বসে ছিলাম। ইতোমধ্যে আমাদের উটটি হোঁচট খেল। আমি বললাম, শয়তান ধ্বংস হোক। তখন নবিজি সা. আমাকে বললেন–

لَا تَقُلْ: تَعِسَ الشَّيْطَانُ، فَإِنَّهُ يَعْظُمُ حَتَّى يَصِيرَ مِثْلَ الْبَيْتِ، وَيَقُولَ: بِقُوَّتِي. قُلْ: بِسْمِ اللهِ. فَإِنَّهُ يَصِيرُ مِثْلَ الذُّبَابِ

'শয়তানের ধ্বংস হোক'– এমন কথা বলো না। কেননা, এতে সে অহংকারে ফুলে-ফেঁপে ঘরের মতো বিরাট আকার ধারণ করে এবং বলে– হ্যাঁ, আমার শক্তিবলেই! (অর্থাৎ, আমার শক্তিবলেই তাকে আমি আছাড় দিয়েছি)। তবে তুমি বিসমিল্লাহ বলো। কেননা, এতে সে ছোটো হতে হতে মাছির মতো হয়ে যাবে। আল-মুজামুল কাবির, তাবারানি : ৫১৬; আবু দাউদ : ৪৮৯৮

শয়তানকে গালি দেওয়া একটি অনর্থক ও নেতিবাচক কাজ। এতে শয়তানের কোনো কষ্ট হয় না; বরং এতে সে আরও খুশি হয় এবং তার আত্মম্ভরিতা বেড়ে যায়। তবে শয়তান কষ্ট পায় এবং দুঃখিত হয়, যদি মানুষ ইতিবাচক কাজের দিকে ধাবিত হয়। যেমন– আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ করে 'বিসমিল্লাহ' বলা। এর মাধ্যমে শয়তান ক্ষীণকায় হতে হতে মাছির মতো ক্ষুদ্র হয়ে যায়।

ইসলামের এ নিগূঢ় তাৎপর্য, ইতিবাচক চিন্তা ও গঠনমূলক নির্দেশনার আলোকে ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জনশক্তিদের তারবিয়াত দিতেন।

ইমাম হাসান আল বান্না ইখওয়ান সদস্যদের আদেশ করতেন– নেতিবাচক চিন্তা, পরনির্ভরশীলতা, আত্মসমর্পণ, কোনো কিছুকে অশুভ মনে করা,

www.bjilibrary.com

ঝগড়াঝাঁটি ও অনর্থক বিবাদ থেকে বেঁচে থাকতে। তিনি ইখওয়ানের সদস্যদের সামনে কাজের বিশাল ক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, যেখানে তারা নিজেদের চিন্তা, চেষ্টা ও সামর্থ্য ব্যয় করতে পারে। এটি একটি বহুমুখী ও বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্র– যার মধ্যে ব্যক্তির পূর্ণ সময়, সামর্থ্য ও প্রতিভাকে ধারণ করার মতো সক্ষমতা রয়েছে। অনুরূপ তার মধ্যে মুমিনদের মনোযোগ আকর্ষণ ও কাছে টানার মতো মনোহারিতাও রয়েছে।

আমি যেন এখনও কান পেতে শুনছি, *আত-তা'আলিম* পুস্তিকায় ইমাম হাসান আল বান্না বাইয়াতের তৃতীয় রুকনের ব্যাখ্যায় কাজের প্রকৃত রূপ ও তার স্তরবিন্যাস করতে গিয়ে বলছেন–

"আমি আসলে আমল বা কাজ বলে বোঝাতে চাই ইলম ও ইখলাসের ফলাফলকে। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা বলেন–

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ۖ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

'(হে নবি!) বলে দিন– তোমরা কাজ করতে থাকো। অচিরেই আল্লাহ তোমাদের আমলগুলো দেখবেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনগণও দেখবেন। আর শীঘ্রই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্যের জ্ঞানীর নিকট। তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) যা কিছু করেছ, তা তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন।'
সূরা তাওবা : ১০৫

ইখওয়ানের সদস্যদের কাছ থেকে যে সকল কাজ চাওয়া হচ্ছে, তার স্তরবিন্যাস হলো :

এক. আত্মগঠন : ইখওয়ানের প্রথম চাওয়া হলো ব্যক্তির আত্মগঠন। যেন তারা হতে পারে সুস্থ-সবল দেহের অধিকারী, মার্জিত চরিত্র ও উন্নত চিন্তার অধিকারী, কর্মতৎপর, বিশুদ্ধ বিশ্বাসের অধিকারী, সুন্নাহ অনুযায়ী ইবাদতকারী, নফসের বিরুদ্ধে জিহাদকারী, সময়ের প্রতি যত্নবান, সকল কাজে সুশৃঙ্খল এবং পরোপকারী। ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যের জন্য এ বৈশিষ্ট্যাবলি অর্জনের চেষ্টা করা আবশ্যক।

দুই. আদর্শ পরিবার গঠন : মুসলিমদের ঘরগুলোকে পরিগঠন করা, বিন্যস্ত করা। নিজের চিন্তা ও আদর্শের প্রতি পরিবারকে শ্রদ্ধাশীল করা,

www.bjilibrary.com

ঘরোয়া জীবনের সকল কাজে ইসলামি আদব ও শিষ্টাচার পরিপালনে যত্নশীল হওয়া, উত্তম স্ত্রী নির্বাচন এবং তাকে স্বীয় অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে অবহিত করা। সন্তানসন্ততি ও কাজের লোকদের শিষ্টাচার শিক্ষাদান এবং তাদেরকে ইসলামের মৌলিক বিধানগুলো পালনে অভ্যস্ত করে তোলা। ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যের ওপর স্বতন্ত্রভাবে এই কাজগুলো আবশ্যক।

তিন. ইসলামি সমাজ বিনির্মাণ : সমাজে ভালো ও কল্যাণের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়া। অশ্লীল ও মন্দ কাজগুলো প্রতিরোধ করে ভালো গুণের প্রসার ঘটানো। সৎকাজের আদেশ ও জনকল্যাণমূলক কাজে অগ্রগামিতা। ইসলামি চিন্তার পক্ষে জনমত গঠন এবং সমাজজীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে ইসলামের রঙে রঙিন করা। ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যের ওপর স্বতন্ত্রভাবে এ কাজগুলো যেমন অপরিহার্য, তেমনি দলের ওপরও সমষ্টিগতভাবে এগুলো অপরিহার্য।

চার. দেশের স্বাধীনতার হেফাজত : দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও তা রক্ষা করা। অর্থাৎ, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আধ্যাত্মিক সকল অঙ্গনকে অনৈসলামি ভিনদেশিদের শাসন ও প্রভাব থেকে মুক্ত করা এবং রাখা। ঔপনিবেশিক শক্তির প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত ও স্বনির্ভর করা।

পাঁচ. ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা : একটি আদর্শ ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করা, যেখানে সরকার জাতির সেবক ও শ্রমদাতা হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে। রাষ্ট্র জাতির কল্যাণে কাজ করবে। রাষ্ট্র ইসলামি হওয়ার পূর্বশর্ত হলো– তার জনগণকে ন্যূনতম মানের মুসলিম হতে হবে, যারা ইসলামের আবশ্যিক বিধানগুলো পালনে হবে যত্নশীল, প্রকাশ্যে পাপাচারে লিপ্ত হবে না, ইসলামি শিক্ষার আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেবে এবং ইসলামের বিধানাবলি বাস্তবায়ন করবে।

ছয়. উম্মাহর ঐক্য সাধন : উম্মাহর জন্য একটি রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো দাঁড় করানো। এর জন্য মুসলিম ভূখণ্ডগুলোকে সাম্রাজ্যবাদের অভিশাপ থেকে মুক্ত করা, সেগুলোর স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা। নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা এবং ঐক্য গড়ে তোলা– যাতে করে তা হৃত খিলাফত ও কাঙ্ক্ষিত ঐক্য পুনরুদ্ধারে সহায়ক হয়।

www.bjilibrary.com

সাত. বিশ্বব্যাপী নেতৃত্ব তৈরি : বিশ্বব্যাপী কাঙ্ক্ষিত নেতৃত্ব তৈরির জন্য পৃথিবীর দিকে দিকে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে হবে, যতক্ষণ-না ফিতনা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর জ্যোতির পূর্ণ বিকাশ ঘটাবেন।

শেষোক্ত চারটি বিষয় দলের ওপর সামগ্রিক দায়িত্ব এবং দলের সদস্য হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির স্বতন্ত্র দায়িত্ব। এগুলো কত বিশাল কাজ! কত গুরুদায়িত্ব! যদিও সাধারণ মানুষ এগুলোকে অলীক কল্পনা মনে করে, কিন্তু ইখওয়ান এগুলোকে বাস্তবিক ও সম্ভব মনে করে। আর আমরা কখনও আমাদের লক্ষ্য নিয়ে নিরাশ হব না। কারণ, আমরা আল্লাহর দরবারে সর্বোচ্চ আশাবাদী। আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে অবশ্যই বিজয়ী করবেন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"

ইখওয়ানের প্রতি ইমাম বান্নার শিক্ষা ও নির্দেশনা ছিল, ইখওয়ান যেন দ্বীনের মৌলিক ও জরুরি বিষয়গুলোকে শাখাগত ও তুলনামূলক কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহের ওপর প্রাধান্য দেয়। এমনিভাবে নিত্যপ্রয়োজনীয় জরুরি মাসয়ালা-মাসায়েল শিক্ষার প্রতি যেন বেশি গুরুত্বারোপ করে এবং নিরর্থক কথা বা কাজে নিজেকে ব্যস্ত করে না ফেলে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম হাসান আল বান্না 'আল-উসুলুল ইশরুন' বা বিশ নীতিমালার নবম নীতিতে বলেন–

وكل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها من التكلف الذي نهينا عنه شرعا، ومن ذلك كثرة التفريعات للأحكام التي لم تقع، والخوض في معاني الآيات القرآنية الكريمة التي لم يصل إليها العلم بعد، والكلام في المفاضلة بين الأصحاب رضوان الله عليهم وما شجر بينهم من خلاف، ولكل منهم فضل صحبته وجزاء نيته وفي التأول مندوحة.

"যেসব মাসয়ালার ওপর আমল করার প্রয়োজন হয় না– এমনসব মাসয়ালা নিয়ে গভীর আলোচনা-পর্যালোচনায় লিপ্ত হতে আমাদের নিষেধ করা হয়েছে। যেমন– অসংঘটিত বিষয়ে অধিক পরিমাণ শাখা মাসয়ালা উদ্‌ঘাটন করা, সাহাবায়ে কেরামের মাঝে কার মর্যাদা কম

www.bjilibrary.com

এবং কার মর্যাদা বেশি– এ নিয়ে তর্ক করা, সাহাবাদের মাঝে সংঘটিত বিরোধ নিয়ে আলোচনা করা ইত্যাদি। সাহাবিদের প্রত্যেকেরই রয়েছে রাসূল সা.-এর সাহচর্যের কারণে বিশেষ মর্যাদা, নিয়তের কারণে প্রতিদান এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করার অধিকার।"

এর দ্বারা ইমাম বান্না বুঝিয়েছেন, শরিয়তের শাখাগত মাসয়ালাসমূহে ফকিহগণের মতপার্থক্য দ্বীন ও ভাষার একটি স্বভাবজাত চাহিদা এবং তাতে কোনো ঝুঁকি বা বিপদের আশঙ্কা নেই। কিন্তু বিপদের আশঙ্কা তখন তৈরি হবে, যখন একে কেন্দ্র করে কেউ গোঁড়ামি, বিচ্ছিন্নতা বা বৈরিতায় লিপ্ত হবে।

ইমাম হাসান আল বান্না অষ্টম নীতিতে বলেন–

والخلاف الفقهي في الفروع لا يكون سببا للتفرق في الدين، ولا يؤدي إلى خصومة ولا بغضاء ولكل مجتهد أجره، ولا مانع من التحقيق العلمي النزيه في مسائل الخلاف في ظل الحب في الله والتعاون على الوصول إلى الحقيقة، من غير أن يجر ذلك إلى المراء المذموم والتعصب.

"শাখাগত মাসয়ালায় ফিকহি মতপার্থক্য কখনোই দ্বীনের মাঝে দলাদলির কারণ হবে না। এ মতপার্থক্য যেন কোনো প্রকার ঝগড়া ও হিংসা-বিদ্বেষের সৃষ্টি না করে। প্রত্যেক মুজতাহিদের জন্যই প্রতিদান রয়েছে। আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং পারস্পরিক সহযোগিতামূলক মনোভাব লালন করে শাখাগত মাসয়ালায় প্রকৃত তাৎপর্য উদ্‌ঘাটনের জন্য বস্তুনিষ্ঠ ইলমি গবেষণায় কোনো সমস্যা নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে, এটা যেন নিন্দিত ঝগড়া ও গোঁড়ামির দিকে না নিয়ে যায়।"

এভাবেই ইমাম বান্না ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সময় ও প্রচেষ্টাকে গোঁড়ামি, অন্যায় পক্ষপাতিত্ব এবং অনর্থক কাজে ব্যয় করা থেকে সংরক্ষণ করেছেন। একই সাথে ইখওয়ানের সদস্যদের উদ্‌বুদ্ধ করেছেন মানুষের জন্য উপকারী ও স্থায়ী কাজের প্রতি মনোনিবেশ করতে।

হাসান আল বান্নার অতি গুরুত্বপূর্ণ দশটি উপদেশ রয়েছে। সেই উপদেশমালা ইখওয়ানের প্রায় প্রত্যেক সদস্যের মুখস্থ আছে। এর সবগুলোতেই ইতিবাচক

www.bjilibrary.com

চিন্তা ও গঠনমূলক কাজে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়েছে এবং অনর্থক, নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক কাজ থেকে বেঁচে থাকার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে। সেই উপদেশগুলো হলো :

এক. পরিবেশ-পরিস্থিতি যা-ই হোক, আযান শোনামাত্রই নামাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করবে।

দুই. কুরআন তিলাওয়াত করবে, অধ্যয়ন করবে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে অথবা আল্লাহর যিকির করবে। একটুখানি সময়ও নিরর্থক কাজে ব্যয় করবে না।

তিন. বিশুদ্ধ আরবি ভাষায় কথা বলার চেষ্টা করবে। কারণ, এটি ইসলামের একটি প্রতীক।

চার. কোনো বিষয়ে অতিমাত্রায় বিবাদে জড়াবে না; তা যেকোনো বিষয়েই হোক। কারণ, বিবাদ কখনও কল্যাণ বয়ে আনে না।

পাঁচ. মাত্রাতিরিক্ত হাসাহাসি করবে না। কারণ, আল্লাহর সাথে যে অন্তর জুড়ে থাকে, তা নীরব ও গাম্ভীর্যপূর্ণ হয়।

ছয়. অত্যধিক হাসি-তামাশা করবে না। কারণ, পরিশ্রমী জাতি কখনও অপ্রয়োজনীয় কাজ ও তামাশায় ব্যস্ত হয় না।

সাত. প্রয়োজনের চেয়ে উচ্চ আওয়াজে কথা বলো না। কারণ, এটি বিবেকশূন্য হওয়ার নিদর্শন এবং এর দ্বারা অন্যের কষ্ট হয়।

আট. মানুষের গিবত এবং বিভিন্ন সংগঠনের নিন্দা পরিহার করে চলবে। কল্যাণকর কথা ছাড়া অন্য কোনো কথা বলবে না।

নয়. ইখওয়ানের যেকোনো সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ হলে তার সাথে পরিচিত হও; যদিও সে তোমার থেকে এমনটি কামনা না-ও করে। কারণ, পরিচিতি ও সৌহার্দ্যই ইখওয়ানুল মুসলিমিনের দাওয়াতের ভিত্তি।

দশ. সময়ের চেয়ে দায়িত্ব অনেক বেশি। কাজেই অন্যকে তার সময় দ্বারা উপকৃত হতে সাহায্য করো। যদি কারও সাথে তোমার জরুরি কাজ থাকে, তাহলে তা সংক্ষেপে সেরে নাও, যেন সে তার প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে।"

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের ইতিবাচক শিক্ষার একটি অন্যতম অংশ হলো– ইখওয়ানের সদস্যরা সমাজের বিকৃতি, মানুষের সমস্যা, আকিদার বিচ্যুতি, ইবাদতে বিদআত, চারিত্রিক অধঃপতন ও ঐক্যের ঘাটতির প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে শুধু ব্যক্তিগত নামাজ, যিকির ইত্যাদি ইবাদত-বন্দেগিতে নিজেকে ব্যস্ত করে তৃপ্তি ও আত্মতুষ্টি অনুভব করে না। সেইসাথে উল্লিখিত সমস্যাগুলোর সামনে নিজেকে নীরব দর্শক ও আত্মসমর্পণকারী বা দুঃখভারাক্রান্ত ও অনুতপ্ত অথবা হতাশ ও নিরাশ কিংবা ক্রন্দনকারী ও বিলাপকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ করে না। বরং ইখওয়ানের সদস্যরা ভুল সংশোধন, বক্রতা দূরীকরণ, দুষ্কৃতকারীদের সঠিক পথে আনয়নের চেষ্টা করে। বিদআতে লিপ্তদের সুন্নাহ অনুসরণ এবং বক্রদের সরল পথে ফিরে আসার দাওয়াত দেয়। অনুরূপ যারা অলসতার চাদর মুড়ি দিয়ে বসে আছে, তাদের কর্মোদ্যমী হওয়ার আহ্বান জানায়। যারা ভয় বা অজানা শঙ্কার কারণে পেছনে পড়ে আছে, তাদের শক্তি ও সাহস জুগিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ইখওয়ানের সদস্যদের একটি আবশ্যিক দায়িত্ব হলো– তারা দাওয়াতের কাজকে নিজের সবচেয়ে বড়ো চিন্তা ও লক্ষ্য বানাবে। এমনকি মাত্র একজন ব্যক্তির ইসলামের হিদায়াত লাভের বিষয়টিকে দুনিয়ার যাবতীয় সম্পদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করবে। ইখওয়ানের সদস্যরা এ কথায় বিশ্বাস রাখবে– মানুষকে আল্লাহর পথে আহ্বান হলো নবি-রাসূল ও তাদের প্রতিনিধিদের কাজ। এটিই জীবনের সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ কর্মতৎপরতা। এ কারণে সর্বদা ইখওয়ানের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল– নিজের সংশোধনের ফিকির করো, অন্যকে ভালো কাজের দাওয়াত দাও এবং এ দুটি কাজ থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয়ো না। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٣٣﴾

"ওই ব্যক্তির চেয়ে উত্তম কথা আর কার হতে পারে, যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, নিজে ভালো কাজ করে আর বলে– নিশ্চয় আমি মুসলিমদের একজন।" সূরা হা-মিম সাজদা : ৩৩

ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে যে দাওয়াতি কাজের চেতনা দিয়ে লালন করা হয়েছে, তা কেবল নির্দিষ্ট কয়েকটি পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণে সীমাবদ্ধ নয়। বরং ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যের মধ্যে এ দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা হয়েছে,

www.bjilibrary.com

সে তার আশপাশের মানুষজনকে দাওয়াত দেবে, আর দাওয়াতের ক্ষেত্রে তার সামর্থ্যের মধ্য থেকে যে জিনিসটি উদ্দিষ্ট ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক কার্যকর মনে করবে, সে পদ্ধতি ও উপকরণ দাওয়াতি কাজে ব্যবহার করবে। সেই পদ্ধতি বা উপকরণ হতে পারে– বক্তব্য, লেখালিখি, কথাবার্তা, স্বাভাবিক পর্যালোচনা, ভালো আচরণ কিংবা ঈমানের দাবিতে মৌনতা অবলম্বন।

ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যের কর্তব্য হচ্ছে– তারা মানুষের সাথে যোগাযোগ রাখবে, সাক্ষাৎ করতে যাবে। প্রয়োজনে তাদের বাড়িতে যাবে; যদিও বাড়ির চেয়ে ব্যক্তিই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এ কথাটি ব্যাপক প্রচলন লাভ করেছে যে– "ভালো মানুষের নিদর্শন হলো, সে যেখানেই যাবে, সেখানেই ভালো কাজের নির্দশন রেখে আসবে।" এ কারণে দেখা যায়, ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্যই দাওয়াতের মেজাজ ও মানসিকতা নিয়ে গড়ে ওঠে এবং স্বীয় কথা ও কাজের মাধ্যমে নিজ পরিমণ্ডলে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। এমনকি এমনও দেখা গেছে যে, ইখওয়ানের দিনমজুর, কৃষক বা ব্যবসায়ী সদস্যও যখন কারও সাথে দাওয়াতের বিষয়ে কথা বলে, তখন শ্রোতা তাদের জামিয়া, আযহার বা অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাঠ সম্পন্নকারী বলে মনে করে। এর কারণ হলো– তারা নিজেদের স্বভাবজাত প্রতিভা ও অর্জিত অভিজ্ঞতার মধ্যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম হয়েছে। তা ছাড়া তাদের আত্মিক পরিশুদ্ধি ও সৎসাহসই তাদের কাজে অন্যতম সহায়ক।

ইখওয়ানের ইতিবাচক মানসিকতা ও গঠনমূলক চিন্তায় অন্যতম সহায়ক হচ্ছে, কর্মীদের সময়ের মূল্য সম্পর্কে সচেতন করা হয় এবং সময়ের যথাযথ ব্যবহারের বিষয়ে উদ্‌বুদ্ধ করা হয়। ইখওয়ানের সদস্যদের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করা হয় যে, কিয়ামতের দিন তার দু পা কিছুতেই আপন জায়গা হতে সরবে না, যতক্ষণ-না সে এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেবে যে, তার জীবন কী কাজে ব্যয় করেছে? তার যৌবনকাল কোন কাজে ফুরিয়েছে?

সুতরাং সময়ের গুরুত্ব প্রশ্নাতীত। আমরা ইতঃপূর্বে ইমামের যে দশটি উপদেশ উল্লেখ করেছি, সেগুলোর মধ্যে দুটি উপদেশে সময়ের গুরুত্ব সম্পর্কে ইঙ্গিত করা হয়েছে। একটি হলো–

> "কুরআন তিলাওয়াত করবে, অধ্যয়ন করবে, মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করবে অথবা আল্লাহর যিকির করবে। একটুখানি সময়ও নিরর্থক কাজে ব্যয় করবে না।"

www.bjilibrary.com

এটি উপর্যুক্ত দশ উপদেশের মধ্যে দ্বিতীয় উপদেশ। আর অপরটি হলো, যা দশম ও সর্বশেষ উপদেশ–

> "সময়ের চেয়ে দায়িত্ব অনেক বেশি। কাজেই অন্যকে তার সময় দ্বারা উপকৃত হতে সাহায্য করো। যদি কারও সাথে তোমার জরুরি কাজ থাকে, তাহলে তা সংক্ষেপে সেরে নাও, যেন সে তার প্রয়োজনীয় কাজ করতে পারে।"

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের জাতীয় দৈনিকে শহিদ হাসান আল বান্না প্রতি শুক্রবার একটি লেখা লিখতেন। সেই লেখাগুলো থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি লেখা হলো– الوقت هو الحياة (সময়ই জীবন)। এ লেখায় ইমাম বান্না বিখ্যাত প্রবাদবাক্য الوقت من ذهب (সময় স্বর্ণের মতো)-কে ভুল আখ্যা দেন। ইমাম হাসান আল বান্না বলেন–

> "বলা হয়ে থাকে– প্রবাদবাক্য الوقت من ذهب (সময় স্বর্ণের মতো)। কথাটি বস্তুবাদীদের দৃষ্টিতে সঠিক, যারা সবকিছুকে বস্তুবাদের মানদণ্ড দ্বারা যাচাই করে। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে– সময় স্বর্ণ থেকে অধিক দামি, এমনকি অন্য সকল মূল্যবান ধাতু থেকেও বেশি দামি। কেননা, স্বর্ণ হাতছাড়া হয়ে গেলে তার বিনিময় বা বিকল্প পাওয়া সম্ভব। কিন্তু এ জগতে সময়ের কোনো বিনিময় বা বিকল্প নেই। বস্তুত কিছু সময়ের সমষ্টিই তো জীবন। সে সময়টুকুই মানুষের জীবন, যা সে তার জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত অতিবাহিত করে।"

ইমাম হাসান আল বান্না রহিমাহুল্লাহ তাঁর এক ডায়েরিতে কিছু কথা লিখে রাখেন। সেই কথাগুলো ইমাম বান্নার এক শিক্ষক তাকে ও ইখওয়ানের কয়েকজন সদস্যকে লক্ষ করে বলেছিলেন। কথাগুলো হলো–

> "আমার ধারণা– আল্লাহ অনেক মানুষের অন্তরকে তোমাদের প্রতি ধাবিত করবেন এবং বহু লোককে তোমাদের কাছে নিয়ে আসবেন। তোমরা মনে রেখ– তোমাদের কাছে যে সকল মানুষ আসবে, আল্লাহ তাদের সময় সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করবেন– তোমরা কি এ সময়ে তাদের কোনো উপকার করতে পেরেছ? তা যদি হয়, তাহলে তারা যেমন নেকি অর্জন করবে, তোমরাও তাদের মতো নেকির ভাগিদার হবে। না-কি তাদের সময়কে বিফলে নষ্ট করেছ? তা যদি হয়, তাহলে তাদেরকে পাকড়াও করা হবে এবং তোমরাও শাস্তির সম্মুখীন হবে।"

www.bjilibrary.com

আমি শুনেছি, ইমাম বান্না তানতা শহরে অনুষ্ঠিত 'ইংরেজ বিতাড়ন ও নীল উপত্যকার ঐক্য' শীর্ষক এক বিশাল জনসভায় এই উপদেশটি বারবার তাকিদের সাথে বলেছেন। জাতীয় দাবিসমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতা সৃষ্টিই ছিল এ জনসভার লক্ষ্য।

রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন রাজনৈতিক দল হিসেবেও আত্মপ্রকাশের ঘোষণা দেয়। এ ঘোষণার পর ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতগণ মিলে ফায়েদ সামরিক ঘাঁটিতে একটি প্রতিনিধি সম্মেলনের আয়োজন করে। সেই সম্মেলনের পর থেকে ইখওয়ানের সদস্যদের নির্বিচারে আটক করা হয়। আটকের পর তাদের তুর অঞ্চলের সর্ববৃহৎ জেলখানায় স্থানান্তর করা হয়। কিন্তু ইখওয়ানের সদস্যরা তখন সেই জেলখানাকেই মসজিদের ন্যায় ইবাদতগাহ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, অনুশীলন কেন্দ্র, প্রশিক্ষণ শিবির ও পরামর্শকেন্দ্রে রূপান্তরিত করে। এমনকি আমরা তখন মজা করে বলতাম– '১৯৪৯ সালের জন্য তুর কারাগার হলো ইখওয়ানুল মুসলিমিনের এমন স্থায়ী শিক্ষাশিবির, যার যাতায়াত ও আবাসনসহ যাবতীয় ব্যয় মিশর সরকার বহন করে!'

এ বিষয়টি আমার রচিত একটি কবিতায়ও চিত্রায়ণের চেষ্টা করেছি। ১৯৫০ সালে জেল থেকে মুক্তি লাভের পর 'সাইয়িদা যায়নাব ময়দান'-এ অনুষ্ঠিত ইখওয়ানের সম্মেলনে আমি সেই কবিতাটি আবৃত্তি করেছিলাম। তার কিছু অংশ হলো–

قالوا : إلى السجن قلنا : شعبة ليجمعونا بها في الله إخوانا
قالوا إلى الطور. قلنا الطور فيه نقرر ما يخشاه أعدانا
فهو المصلى نربي فيه أنفسنا وهو المصيف نقوي فيه أبدانا
معسكر صاغنا جندا لمعركة ومعهد زادنا بالحق عرفانا
من حرموا الجمع منا فوق أربعة ضموا الألوف بغاب الطور أسدانا
راموه منفى وتضييقا فكان لنا بنعمة الحب والإيمان بستانا
هذا هو الطور شاءوا أن نذوب به وشاء ربك أن نزداد إيمانا

www.bjilibrary.com

"তারা বলল, তোমরা জেলখানায় যাও। আমরা বললাম, আমরা দলবদ্ধভাবে যাচ্ছি। এভাবে আল্লাহ আমাদের ভাইদের সেখানে সমবেত করবেন।

তারা বলল, তোমরা তুরে যাও। আমরা বললাম, হ্যাঁ, তুরে গিয়ে আমরা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব, শত্রুরা আমাদের ব্যাপারে যে বিষয়ে ভয় করে।

এটি হবে আমাদের নামাজের জায়গা, যেখানে আমরা আত্মার পরিচর্যা করব এবং এটি হবে আমাদের জন্য গ্রীষ্মকাল, যেখানে আমরা নিজেদের দৈহিক শক্তি বৃদ্ধি করব।

এটি হবে আমাদের সেনাঘাঁটি, যা আমাদের যুদ্ধের সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত করবে। এটি হবে আমাদের শিক্ষালয়, যা আমাদের সত্যের জ্ঞান বৃদ্ধি করবে।

যারা আমাদেরকে চারের অধিক লোকের একত্রিত হওয়াকে বাধা দিয়েছে, নিজেদের অজান্তে তারা তুরের বনে হাজারো সিংহের সম্মিলন ঘটিয়েছে।

তারা নির্বাসিত করে আমাদের ওপর সংকীর্ণতা আরোপ করতে চেয়েছে, কিন্তু সে জায়গাটিই আমাদের জন্য মহব্বত এবং পরিণত হয়েছে ঈমানের বাগিচায়।

এটি সেই তুর– যেখানে তারা আমাদের দমাতে চেয়েছে, কিন্তু প্রতিপালক চেয়েছেন আমাদের ঈমানি শক্তি বাড়িয়ে দিতে।"

এ পরিস্থিতি দেখে থানার জল্লাদবৎ অফিসাররা এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। এরপর তারা চেষ্টা শুরু করে, ইখওয়ানুল মুসলিমিন যেন জেলখানা বা বন্দিশিবিরে অবস্থানকালে নিজেদের মধ্যে কিংবা জেলখানার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মাঝে দাওয়াতি কাজ চালাতে না পারে। ফলে, ১৯৫৪ সালে তারা বন্দিদের সামরিক জেলখানায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, যেখানে ছিল প্রত্যেকের জন্য পৃথক পৃথক সেলের ব্যবস্থা। সেই সেলগুলোর দরজা সব সময় বন্ধই থাকত। দিন-রাত মিলিয়ে শুধু সামান্য সময়ের জন্য গোসল ও প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারার জন্য খোলা হতো। তার ওপর সেখানে নির্দেশ ছিল অতি অল্প সময়ে প্রয়োজন সারার। সামান্য দেরি হলেই চাবুকের আঘাতে পিঠ রক্তাক্ত করে দেওয়া হতো। সেখানে ছিল না পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ বা সমবেত হওয়ার কোনো সুযোগ; এমনকি নামাজের জন্যও না। সেইসাথে সেখানে কোনো বই-কিতাব রাখার অনুমতি ছিল না; এমনকি আল্লাহর কিতাব কুরআনও।

www.bjilibrary.com

এরপরও কারার সেলগুলো যিকির, তাসবিহ ও শান্তিপূর্ণ দারসের হালকায় পরিণত হলো। যখনই চাবুকের আঘাত কিছু সময়ের জন্য বন্ধ থাকত, সেই সুযোগে এমন হালকা বসে যেত।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের কিছু সদস্যকে অধিক শাস্তি ও কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে মরুভূমির 'মাহারিক' সামরিক কারাগারে স্থানান্তর করা হয়েছিল। পরে তারা আমার কাছে বর্ণনা করেছেন, কীভাবে তারা অতি স্বল্প সময়ের মধ্যে জেলচত্বরের শুষ্ক, অনুর্বর ভূমিকে সবুজ-শ্যামল বাগিচায় রূপান্তরিত করেছিলেন। সে বাগিচায় ছিল বিভিন্ন জাতের শস্য, ফসল, ফল, ফুল ও গৃহপালিত প্রাণি। এগুলোর মাধ্যমে সেনাকর্মকর্তা ও সাধারণ সৈনিকরা এবং তাদের প্রতিবেশীরাও উপকৃত হতে শুরু করে। একদিন কিছু নিষ্ঠুরপ্রাণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কারা-পরিদর্শনে এলো এবং তাদের সাথে প্রসিদ্ধ জল্লাদ হামজা বাসায়ুনিও ছিল। তারা বন্দিদের এ কর্মযজ্ঞ দেখে চরম ক্ষিপ্ত হলো এবং ক্ষোভে ফেটে পড়ল। তারা আশ্চর্য হলো এ কথা ভেবে যে, দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে এমন কর্মোদ্দীপনা ও সৃষ্টিশীল কাজের মানসিকতা কীভাবে তৈরি হয়? অতঃপর তারা কয়েদিদের ঘামে সুশোভিত বাগান ও উৎপাদন ধ্বংস ও বিনাশ করার হুকুম করল। যাওয়ার সময় স্থানীয় কারা-কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়ে গেল, কয়েদিদের জন্য বন্দিত্বকে আরও কঠোর করতে, যেন তারা কিছুতেই কর্মময় জীবনে ফিরতে না পারে।

ইমাম হাসান আল বান্নার স্বপ্ন ছিল, তাঁর এই দাওয়াত ও আন্দোলনের মিশনটি হবে কর্মমুখর, পরিগঠন ও বিনির্মাণমূলক। ইমাম বান্নার স্বপ্ন এমন ছিল না যে, তাঁর এ আন্দোলন অন্যান্য অ্যাকাডেমিক বা তাত্ত্বিক আন্দোলনের মতো হবে, যার পরিধি হবে বিশাল বিশাল অট্টালিকার চৌহদ্দির মধ্যেই সীমাবদ্ধ, যা প্লেটোর প্রজাতন্ত্রের ন্যায় আদর্শ প্রজাতন্ত্রের রূপ পরিগ্রহ করবে কিংবা ফারাবির মদিনাদর্শনের ন্যায় মর্যাদাপূর্ণ শহরের রূপ ধারণ করবে; যদিও ইমাম বান্নার আন্দোলন ও দর্শনে জ্ঞান-গবেষণার যথেষ্ট উপাদান ছিল।

অনুরূপ ইমাম বান্নার ইচ্ছা এমনও ছিল না যে, তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলটি কেবল বিতর্কে পটু হবে, যার সদস্যরা বাইজেন্টাইন বিতর্ককে নিমিষেই বিলীন করে দেবে, যারা অন্য সকল দ্বীনি জামায়াতের চেয়ে তর্কে অগ্রগামী হবে অথবা যারা অধঃপতন ও দুর্বলতার যুগে উম্মাহর ওপর কেবল বড়ো বড়ো বক্তব্য দিয়ে কর্তৃত্ব করবে। ইমাম বান্না স্বীয় অনুসারীদের নিরর্থক বিতর্ক থেকে সব সময়

www.bjilibrary.com

সতর্ক করেছেন। অর্থাৎ, এমন বাদানুবাদ যা নিষ্ফল; উপরন্তু তা মানুষের অন্তরকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলে। ইমাম হাসান আল বান্না বারংবার এ হাদিসের পুনরাবৃত্তি করতেন–

مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ.

"হিদায়াত লাভের পর সেই সম্প্রদায় পথভ্রষ্ট হয়, যারা নিজেদের মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়ে।" তিরমিযি : ৩২৫৩; ইবনে মাজাহ : ৪৮; আহমাদ : ২২১৬৪

***

www.bjilibrary.com

চতুর্থ অধ্যায়

ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা

ইসলামি শিক্ষার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা। ইমাম হাসান আল বান্না ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার প্রতি মানুষকে আহ্বান জানিয়েছেন এবং তাঁর অনুসারীদের তা শিক্ষা দিয়েছেন।

বাস্তবে সকল জাতি ও গোষ্ঠীর মধ্যে মুসলিমরাই হলো ভারসাম্যপূর্ণ জাতি। আবার মুসলিমদের বিভিন্ন দলের মধ্যে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতই হলো ভারসাম্যপূর্ণ দল। অনুরূপ ইসলামি দলগুলোর মধ্যে ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো একটি ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যমপন্থি দল।

ইখওয়ানের ভারসাম্যপূর্ণ ও মধ্যপন্থি হওয়ার কারণ– তারা সমন্বয় করে বিবেক ও আবেগের মধ্যে, জাগতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে, চিন্তা ও কাজের মধ্যে, ব্যক্তি ও সমাজের চাহিদার মধ্যে, পরামর্শ ও আনুগত্যের মধ্যে, অধিকার ও দায়িত্বের মধ্যে এবং ঐতিহ্য ও সামসময়িকতার মধ্যে।

এ আন্দোলন ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল উত্তরাধিকার হতে উপকৃত হতে চেষ্টা করেছে। এরই ধারাবাহিকতায় তা শরিয়া বিশেষজ্ঞগণ থেকে বিধান ও দলিল গ্রহণের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। কালাম শাস্ত্রবিদগণের থেকে আকিদাসংক্রান্ত দলিল গ্রহণ এবং সংশয় নিরসনের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে। তাসাউফ তথা আত্মশুদ্ধিবিষয়ক বিশেষজ্ঞ আলিমগণের থেকে উপকৃত হয়েছে প্রবৃত্তির চাহিদাকে সংযত করে অন্তরকে পবিত্রীকরণের মাধ্যমে। সেইসাথে আত্মশুদ্ধিমূলক শাস্ত্রের সাথে বিভিন্ন কুসংস্কার ও পঙ্কিলতা যুক্ত হয়েছিল, তার থেকে মুক্ত হয়ে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল সা.-এর বিশুদ্ধ ঝরনা থেকে পানি আহরণের মাধ্যমেও তৃপ্ত হয়েছে।

ইমাম হাসান আল বান্না ফিকহি উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে এর সকল মাযহাব ও মতাদর্শকে প্রত্যাখ্যান করেননি, যেমনটি অনেকে করেছেন। আবার তিনি সবগুলোকে ব্যাপকভাবে গ্রহণও করেননি, যেমনটি অনেকে করেছেন। ইমাম বান্না যেমন তাঁর সংগঠনে নির্দিষ্ট মাযহাবের অনুসরণকে আবশ্যক করেননি,

www.bjilibrary.com

আবার তার অনুসরণকে নিষেধও করেননি। বরং তিনি কিছু শর্তসাপেক্ষে এ বিষয়ে উদার অবস্থান গ্রহণ করে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থার উৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করেছেন। ইমাম বান্না এ সম্পর্কে বিশ মূলনীতির সপ্তম নীতিতে বলেন–

ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفرعية أن يتبع إماما من أئمة الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف أدلته، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر.

"যে সকল মুসলিম শাখাগত ফিকহি বিধিবিধানের দলিল যাচাই-বাছাই করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে না, তারা ইমামদের মধ্য থেকে কোনো একজন ইমামের অনুসরণ করবে। তবে এর পাশাপাশি কোন বিধানের ক্ষেত্রে তার ইমামের দলিল কী– তা জানার চেষ্টা করাটা তার জন্য উত্তম হবে। আর তার উচিত হবে– দলিলনির্ভর সকল নির্দেশনাই মেনে নেওয়া, যদি দলিলদাতার সততা ও যোগ্যতা প্রমাণিত হয়। তবে তিনি যদি আলিম হন, তাহলে তার উচিত হবে– জ্ঞানগত অপূর্ণতা দূর করে যাচাই-বাছাই করার স্তরে পৌঁছানো।"

এই কথার অর্থ কিন্তু এ নয় যে, দ্বীনের ইমামগণ যা বলেছেন সবই নিশ্চিতরূপে সত্য ও সঠিক। কারণ, তিনিও তো সত্যসন্ধানী মুজতাহিদ। তিনি যদি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন, তাহলে দুটি নেকি পাবেন। আর যদি ভুল করেন, তাহলে বিনিময়ে একটি নেকি পাবেন। যদি কখনও কোনো বিষয়ে ইমামের ভ্রান্তি প্রকাশ পায়, তাহলে সে বিষয়ে তার অনুসরণ করা আমাদের জন্য আবশ্যক হবে না। এ কারণে ষষ্ঠ নীতিতে ইমাম হাসান আল বান্না সুস্পষ্ট ভাষায় বলেন–

وكل أحد يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وإلا فكتاب الله وسنة رسوله أولى بالاتباع، ولكنا لا نعرض للأشخاص فيما اختلف فيه بطعن أو تجريح، ونكلهم إلى نياتهم وقد أفضوا إلى ما قدموا.

www.bjilibrary.com

"আল মাসুম (মুহাম্মাদ সা.) ছাড়া অন্য সবার কথা গ্রহণ করাও যাবে, আবার বর্জনও করা যাবে। সালাফদের থেকে আসা যা কিছু কুরআন-সুন্নাহর সাথে মিলে যাবে– তা আমরা গ্রহণ করব। (আর যদি না মেলে) তাহলে আল্লাহর কিতাব ও রাসূল সা.-এর সুন্নাহই অনুসৃত হওয়ার অধিক দাবিদার। তবে মতপার্থক্যের কারণে আমরা কোনো ব্যক্তিকে বিদ্রুপ বা দোষারোপ করব না। আমরা তাদেরকে তাদের নিয়তের ওপর ছেড়ে দেবো। তারা তাদের কর্মের উপযুক্ত প্রতিদান পাবেন।"

এটি হলো এমন ভারসাম্য ও মধ্যমপন্থা, যে ব্যাপারে কারও বিবাদ করার সাধ্য নেই। শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া তাঁর رفع الملام عن أئمة الأعلام গ্রন্থে এ অবস্থানই ব্যক্ত করেছেন।

ইসলামি আন্দোলনের অগ্রদূত হাসান আল বান্না এখানে এসে যাত্রাবিরতি করেননি। তিনি ঘোষণা করেছেন– যে সকল মতামত ও জ্ঞান কালের আবর্তে সমকালীন যুগ ও পরিবেশ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং সেই রঙে রঙিন হয়েছে, চতুর্দশ শতাব্দীতে এসে ইসলামের দাঈদের জন্য সে সবকিছুকে আঁকড়ে ধরে রাখার কোনো আবশ্যকতা নেই; বরং তাদের মতো করে আমাদেরও গবেষণা ও উদ্ভাবনের অবকাশ আছে। যদিও আমরা তাদের গবেষণাকে বাতিল বলছি না এবং তা থেকে উপকৃত হতে কার্পণ্য করছি না। কেননা, নিঃসন্দেহে তাদের সেই গবেষণা আমাদের জন্য এক বিশাল সম্পদ।

ইমাম বান্না 'পঞ্চম সম্মেলনের বার্তা'য় বলেন–

"ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিশ্বাস করে, ইসলামি শিক্ষার ভিত্তি ও উৎস হচ্ছে– আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। এ দুটি জিনিসকে আঁকড়ে ধরলে উম্মাহ কখনও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হবে না। ইসলামের সাথে যে বহু মত ও জ্ঞান-গবেষণা যুক্ত হয়েছে এবং ইসলামের রঙে রঙিন হয়েছে, দেখা যায়– এগুলোর অনেকেই তার উদ্ভাবনী যুগ ও সমকালীন জাতিগোষ্ঠীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং তার রং ধারণ করেছে। এ কারণে ইসলামি শাসনব্যবস্থার নীতিমালা আহরণের ক্ষেত্রে অবশ্যই এর বিশুদ্ধ ও স্বচ্ছ ঝরনা থেকে বিধান গ্রহণ করতে হবে এবং পূর্বসূরি সাহাবা ও তাবেয়িদের মতো করে ইসলামকে বুঝতে হবে। অনুরূপ আল্লাহপ্রদত্ত

www.bjilibrary.com

সীমারেখার সামনে নিজেদের সংবরণ করতে হবে; যেন আমরা আল্লাহপ্রদত্ত বিধান উপেক্ষা করে নিজেদের ওপর শাস্তি অবধারিত না করি; অনুরূপ আমাদের যুগের সাথে সংগতিপূর্ণ নয় এমন কোনো বিষয়কে তার সাথে যুক্ত না করি। কেননা, আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ইসলাম হলো সমগ্র মানবতার দ্বীন।"

এটিই হলো সত্য ও ভারসাম্যের আধুনিক রূপায়ণ; এটি নয় কোনো প্রান্তিকতা ও জুলুমের বাতাবরণ। ফিকহ, ইজতিহাদ, তাকলিদ, নির্দিষ্ট মাযহাব গ্রহণ ও বর্জনের বিষয়ে এটিই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান। যেখানে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির কোনো সুযোগ নেই।

এমনিভাবে আকিদা ও তৎসংশ্লিষ্ট মতভেদপূর্ণ বিষয়াবলি, ফিকহের জটিল বক্তব্যসমূহ অনুধাবন এবং বিভিন্ন দল ও ফিরকার মতপার্থক্যের ক্ষেত্রে ইমাম হাসান আল বান্নার অবস্থান ছিল ভারসাম্যপূর্ণ।

ইমাম বান্না ছিলেন আকিদার ক্ষেত্রে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের অনুসারী। আল্লাহ তায়ালার গুণাবলি-সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদিসসমূহ অনুধাবনের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরিদের নীতি ও পদ্ধতিকে ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি ছিলেন তাওহিদ প্রতিষ্ঠা এবং ছোটো-বড়ো, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার শিরকের বিরুদ্ধে সংগ্রামী পুরুষ। তিনি মূর্তিপূজার সকল বৈশিষ্ট্য ও আনুষ্ঠানিকতাকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছেন। সেইসাথে ওইসকল শিরকি কুসংস্কারের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন– যা মুসলমানদের জনজীবনে প্রবেশ করে তাদের আকিদা, ইবাদত, চিন্তাচেতনা, আবেগ-অনুভূতি ও গতি-প্রকৃতিকে নষ্ট করে দিয়েছে। যেমন– শিরক প্রভাবিত পদ্ধতিতে মাজার জিয়ারত, ওলি-আওলিয়াদের নিকট সাহায্যকামনা, গণক ও জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে ভাগ্যগণনা করা এবং তাদের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি বাতিল কর্মকাণ্ড ও দ্বীনের বিকৃতিমূলক কাজ। এমনকি ইমাম বান্না এ সকল শিরকি ও বিদআতি কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানুষের মনোজগতে বিপ্লব ঘটিয়েছেন। তাঁর এক প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বুদ্ধিদীপ্ত বক্তব্যে উপর্যুক্ত শিরকি ও বিদআতি কাজসমূহ প্রত্যাখ্যানের বিষয়টি সুন্দররূপে ফুটে ওঠে, যে বক্তব্যের মধ্যে তিক্ত সত্য এবং প্রজ্ঞাপূর্ণ দাওয়াত ও উত্তম উপদেশের মধ্যে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। যেমন, ত্রয়োদশ মূলনীতিতে ইমাম বান্না বলেন–

www.bjilibrary.com

ومحبة الصالحين واحترامهم والثناء عليهم بما عرف من طيب أعمالهم قربة إلى الله تبارك وتعالى. والأولياء هم المذكورون بقوله تعالى (الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ). والكرامة ثابتة بشرائطها الشرعية. مع اعتقاد أنهم رضوان الله عليهم لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً في حياتهم أو بعد مماتهم فضلاً عن أن يهبوا شيئاً من ذلك لغيرهم.

"নেককারদের ভালোবাসা এবং তাদের উত্তম কর্মের প্রশংসা করা আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আওলিয়া তো তারাই, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন– 'তারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অবলম্বন করে' (সূরা ইউনুস : ৬৩)। আর (আওলিয়াদের) কারামত কিছু শরয়ি শর্তের আলোকে প্রমাণিত বিষয়। তবে কারামতের ক্ষেত্রে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, তাদের ওপর আল্লাহ তায়ালা সন্তুষ্ট, কিন্তু তারা জীবদ্দশায় বা মৃত্যুর পরে নিজেদের কোনো উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না; অন্যের উপকার বা ক্ষতি করা তো আরও সুদূর পরাহত বিষয়।"

ইমাম বান্না আরও বলেন–

"হাদিসে বর্ণিত পদ্ধতি অনুযায়ী কবর যিয়ারত করা একটি প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত। কিন্তু কবরবাসীর কাছে –সে যেই হোক– সাহায্য কামনা করা, তাদের ডাকা, তাদের কাছে নিজেদের প্রয়োজন পেশ করা– দূর থেকে হোক বা কাছে থেকে, তাদের নামে মানত করা, কবর পাকা করা, তা পর্দাবৃত করা, কবরে আলোকসজ্জা করা, কবর স্পর্শ করা এবং আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কারও নামে কসম করা ইত্যাদি কুসংস্কার ও কবিরা গুনাহ। আর এসবের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া ওয়াজিব। আমরা এ সকল নিষিদ্ধ কাজের বৈধতা প্রদানের জন্য কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করব না।"

এমনিভাবে আমরা দেখি– ইমাম বান্না বাতিলের প্রতিরোধে হক কথা প্রচারের প্রতি অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি অন্যায় কাজে বাধা দানের পূর্বে কাজের সঠিক পন্থাও পরিচয় করিয়ে দিতেন। এ কৌশলের মাধ্যমে বাতিলে নিমজ্জিত অন্তরগুলোকে তিনি সত্য ও সঠিক পন্থার প্রতি উদগ্রীব করে তুলতেন

www.bjilibrary.com

এবং একজন সুপথপ্রাপ্ত, প্রাজ্ঞ ও দরদি মুরব্বির ভূমিকা পালন করতেন। কিন্তু তিনি বাতিলপন্থিদের সাথে সমঝোতা এবং বিরোধীদের চিত্তরঞ্জনের চেষ্টা করতেন না।

অনুরূপ আল্লাহ তায়ালার সিফাত (গুণাবলি)-এর বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে যে মতপার্থক্য রয়েছে –যেমন কেউ অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় নিয়েছেন, আবার কেউ মোটেও ব্যাখ্যার আশ্রয় নেননি– এক্ষেত্রে হাসান আল বান্না কুরআন-হাদিসের বিশুদ্ধ ঝরনার ওপর নির্ভর করে এ মতপার্থক্যকে সম্পূর্ণরূপে এড়িয়ে গেছেন এবং দূরবর্তী ব্যাখ্যার আশ্রয়গ্রহণ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করেছেন। সেইসাথে আল্লাহ তায়ালার গুণাবলিকে একেবারে বাতিল সাব্যস্তকরণের গুনাহ থেকেও ইমাম বান্না নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখেছেন। যেমন, দশম মূলনীতিতে ইমাম বান্না বলেন–

ومعرفة الله تبارك وتعالى وتوحيده وتنزيهه أسمى عقائد الإسلام. وآيات الصفات وأحاديثها الصحيحة وما يليق بذلك من التشابه. نؤمن بها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل. ولا نتعرض لما جاء فيها من خلاف بين العلماء. ويسعنا ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه (وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا) آل عمران:7.

"আল্লাহ তায়ালার মারিফাত, তাঁর তাওহিদ এবং সকল প্রকার ত্রুটি থেকে তাঁর পবিত্রতা ইসলামি আকিদার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আল্লাহ তায়ালার সিফাত সম্পর্কিত আয়াত, সহিহ হাদিস এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট মুতাশাবিহাত আমরা সেভাবেই বিশ্বাস করি– যেভাবে তা বর্ণিত হয়েছে। আমরা এগুলোকে ব্যাখ্যাও করি না, বাতিলও করি না। এ ব্যাপারে আলিমদের মাঝে হওয়া মতবিরোধ থেকে আমরা দূরে থাকব। এক্ষেত্রে রাসূল সা. ও সাহাবিদের এ মনোভাব অনুসরণ করাই আমরা যথেষ্ট মনে করি– 'আর যারা জ্ঞানে সুগভীর, তারা বলে, আমরা এগুলোতে ঈমান রাখি। আর এর সবই আমাদের রবের কাছ থেকে এসেছে' (সূরা আলে ইমরান : ৭)।"

তাসাউফের ব্যাপারেও ইমাম বান্নার অবস্থান ছিল ন্যায়নিষ্ঠ ভারসাম্যপূর্ণ। তিনি সুন্নাত ও বিদআতের বাছবিচার না করে কোনোকিছু গ্রহণ করেননি।

www.bjilibrary.com

অনুরূপভাবে ভুল-শুদ্ধ এবং ভালো-মন্দের যাচাই না করে তাকে পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করেননি। বরং এক্ষেত্রে ইমাম বান্নার নীতি ছিল– বিশুদ্ধটিকে গ্রহণ করো এবং আবর্জনাটুকু বর্জন করো। অতএব, তাসাউফের সবটুকু বাতিল নয়, যেমন এর সবটুকু বিশুদ্ধও নয়। সকল তাসাউফ চর্চাকারী বিদআতে লিপ্ত নয়, আবার তাদের সকলেই সুন্নাহর ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। কাজেই এক্ষেত্রে বাছবিচার ও বিচার-বিশ্লেষণ করে পূর্বসূরিদের রেখে যাওয়া সম্পদ দ্বারা উপকৃত হতে হবে। কেননা, তাসাউফের মধ্যে এমন উদ্দীপনা ও প্রভাব আছে– যা অন্য কোথাও নেই। সুফিদের বক্তব্য অন্তরে এত বেশি রেখাপাত করে যে, অন্য কারও বক্তব্য তা করে না। *মুযাক্কিরাতুদ দাওয়াহ ওয়াদ দাইয়াহ* গ্রন্থে ইমাম বান্না তাসাউফের ব্যাপারে স্বীয় মতামত সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

যদিও ইমাম বান্না প্রথমদিকে একটি সুফি তরিকার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে কাজ শুরু করেছিলেন, কিন্তু তিনি এর মাঝে নিজেকে বিলীন করে দেননি; বরং ইমাম বান্না এর দ্বারা উপকৃত হয়ে সেই পথটি পরিহার করেছেন। যেমনটি তিনি নিজের ব্যাপারে এবং তাঁর বন্ধু সুক্কারির ব্যাপারে বলেন– 'যদিও আমরা মুরিদ হয়েছিলাম; কিন্তু স্বকীয় চিন্তার অধিকারী ছিলাম এবং ইবাদত, যিকির ও তরিকতের নিয়মকানুনের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল ও নিষ্ঠাবান ছিলাম।'

উপরন্তু সেই তরিকাটি ছিল অন্য সকল তরিকার তুলনায় বিদআত থেকে অধিক দূরবর্তী এবং সুন্নাতের অধিক নিকটবর্তী। ইমাম বান্না মূলত এ তরিকার প্রতি মুগ্ধ হয়েছিলেন তাঁর শাইখের সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ– এমনকি শাসক ও প্রভাবশালীদের বেলায়ও, সুন্নাহর অনুসরণ এবং বিদআতসমূহের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে শক্ত অবস্থানের কারণে। লোকেরা শাইখের যে বিভিন্ন কারামত ও সাধারণ রীতিবিরুদ্ধ আশ্চর্য ঘটনার কথা বলত, ইমাম বান্না এসবের প্রতি খুব একটা গুরুত্ব দিতেন না। বরং তাঁর দৃষ্টিতে কারামত ও আশ্চর্য ঘটনার চেয়ে মানুষের হিদায়াত এবং হক কথা প্রচারই ছিল মুখ্য।

তাসাউফ চর্চাকারী বহু লোকের মধ্যে যে সকল বিদআত ও কুসংস্কারের ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল; যেমন– ভ্রান্ত রীতিতে মাজার জিয়ারত, কবরের দ্বারা বরকত কামনা করা, মৃতদের কাছে প্রার্থনা করা, তাবিজ ঝোলানো ইত্যাদি বিষয়ের প্রতি ইমাম হাসান আল বান্না মোটেও নমনীয় ছিলেন না। বরং ইমাম বান্না তাঁর বিশটি নীতিমালায় এসবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দিয়েছেন।

www.bjilibrary.com

সেইসাথে তিনি এগুলোকে এমন কবিরা গুনাহ হিসেবে গণ্য করেছেন, যার বিরুদ্ধে লড়াই করা ওয়াজিব। ইমাম বান্না বলেন–

> "এসকল নিষিদ্ধ কাজের বৈধতা দেওয়ার জন্য আমরা কোনো ধরনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আশ্রয় গ্রহণ করব না।"

তা সত্ত্বেও ইমাম বান্না বিদআত দূরীকরণ ও তা প্রতিরোধের বিষয়ে বলেন–

> "আল্লাহর দ্বীনের মধ্যে নব-আবিষ্কৃত সকল বিষয় ভিত্তিহীন, মানুষ নিজেদের প্রবৃত্তির তাড়নায় যেগুলোকে উত্তম মনে করেছে– তা সংযোজনের মাধ্যমে হোক কিংবা বিয়োজনের মাধ্যমে। এগুলো ভ্রষ্টতা, যার বিরুদ্ধে লড়াই করে এগুলোকে নির্মূল করা ওয়াজিব। তবে এক্ষেত্রে এমন সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করতে হবে, যা পূর্বের চেয়ে কোনো মন্দ পরিণতি ডেকে আনবে না।"

এটিই প্রকৃত সমঝ ও প্রজ্ঞা। কেননা, অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে গিয়ে যদি আরও বড়ো অন্যায়ের সম্মুখীন হতে হয়, তবে সেখানে চুপ থাকা কর্তব্য। এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহয় একটি মূলনীতিও রয়েছে, যেমনটি উসূলের গ্রন্থসমূহে বিবৃত হয়েছে।

ইমাম বান্না পবিত্র রমজান মাসে আট রাকাত তারাবির নামাজ আদায় করতেন। কারণ, আয়িশা রা. থেকে একটি সহিহ হাদিসে এমনটিই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু কেউ বিশ রাকাত পড়তে চাইলে তিনি তাতে নিষেধ করতেন না। কেননা, উভয় রীতিরই আপন মতের পক্ষে দলিল ও যুক্তি আছে। আর শাখাগত বিষয়ে মতপার্থক্য থাকবেই। এর কিছু কারণ ইমাম বান্না তাঁর পুস্তিকায়ও বর্ণনা করেছেন।

ইমাম হাসান আল বান্নার ব্যাপারে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার তিনি এক শহরে সফরে ছিলেন, এর অধিবাসীরা তারাবির নামাজ আট রাকাত না বিশ রাকাত– এ নিয়ে মতবিরোধ করছিল। এমনকি তাদের মধ্যকার এ বিরোধ চরম আকার ধারণ করে ঝগড়া ও মারামারির উপক্রম হয়। তখন উভয় পক্ষ ইমাম বান্নার কাছে তাদের প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হয়। কিন্তু তিনি তাদের প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন– 'আপনারা বলুন তো, তারাবির নামাজ সুন্নাত না ফরজ?' সকলেই উত্তর দিলো, এটি একটি সুন্নাত আমল। এরপর তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, 'মুসলিমদের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্য রক্ষা করা সুন্নাত না ফরজ?' উত্তর এলো, এটি ফরজ কাজ।

www.bjilibrary.com

তখন তিনি খুব জোরালো ভাষায় বললেন, 'আপনারা একটি সুন্নত রক্ষা করতে গিয়ে একটি ফরজকে কীভাবে বিনাশ করছেন? আপনাদের এই ঝগড়াঝাটির চেয়ে এটিই শ্রেয় যে, আপনারা মসজিদের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে তারাবির নামাজ আদায় করবেন এবং নিজেদের ভ্রাতৃত্ব অটুট রাখবেন।'

হাসান আল বান্নার একটি অনন্য বৈশিষ্ট্য ছিল– তাঁর মধ্যে পূর্বসূরিদের বুদ্ধিদীপ্ত চিন্তা ও সুফিগণের পরিশীলিত অন্তরের অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল। তিনি স্বীয় অনুসারীদের থেকেও এমনটিই প্রত্যাশা করতেন।

আকিদার ক্ষেত্রে ইমাম বান্না ছিলেন সালফে সালিহিনদের বিশুদ্ধ অনুসারী। তিনি তাওহিদে বিশ্বাস করতেন এবং ছোটো-বড়ো, প্রকাশ্য ও গোপন সকল প্রকার শিরকের বিরুদ্ধে লড়াই করতেন। আল্লাহ তায়ালার সিফাত (গুণাবলি)-সংশ্লিষ্ট আয়াত ও হাদিসের ক্ষেত্রে তিনি পূর্বসূরিদের নীতির অনুসরণ করতেন। যেমনটি তিনি 'আকায়িদ' পুস্তিকায় এবং 'বিশ নীতিমালা'য়– এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।

ইবাদতের ক্ষেত্রেও ইমাম বান্না ছিলেন সুন্নাহর অনুসারী এবং বিদআত পরিহারকারী। কারণ, তিনি বিশ্বাস করতেন– প্রত্যেক বিদআত গোমরাহি এবং প্রত্যেক গোমরাহি জাহান্নামে নিয়ে যায়।

তবে আত্মশুদ্ধি অর্জন, চরিত্রকে মার্জিতকরণ, অন্তরের ব্যাধিসমূহের চিকিৎসা, প্রবৃত্তির চাহিদার বিরোধিতা এবং মানুষের অন্তরে শয়তানের প্রবেশের ছিদ্রপথগুলো বন্ধ করার ক্ষেত্রে ইমাম বান্না ছিলেন তাসাউফপন্থি এবং পরিশীলিত রুচিবোধ ও সতর্কদৃষ্টির অধিকারী। ইমাম বান্না নিজের এবং অনুসারীদের জন্য পূর্বসূরিদের এমন গ্রন্থ ও রীতি-পদ্ধতি বাছাই করতেন, যা আত্মাকে সঞ্জীবিত করে, অন্তরকে পবিত্র করে এবং আল্লাহর প্রতি নির্ভরতা ও ইখওয়ানের সদস্যদের মধ্যে সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে। এক্ষেত্রে তাঁর অবস্থান অনেকটা শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়া রহ. এবং তাঁর ছাত্র আল্লামা ইবনুল কাইয়িম রহ.-এর অবস্থানের সাথে মিলে যায়। কারণ, তাঁরাও তাসাউফের জ্ঞান অর্জন, তদনুযায়ী আমল করা এবং তা শিক্ষাদানের মাধ্যমে নিজেরা যেমন উপকৃত হয়েছেন, তেমনি অন্যদেরও উপকৃত করেছেন। তাঁরা উভয়ে এ বিষয়ে একাধিক গ্রন্থ ও পুস্তিকা রচনা করেছেন। 'ফাতাওয়া ইবনু তাইমিয়া'য় এ বিষয়ে দুটি পুস্তিকা সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি 'আত-তাসাউফ' শিরোনামের অধীনে রয়েছে এবং দ্বিতীয়টি রয়েছে 'আস-সুলুক' শিরোনামে।

www.bjilibrary.com

আর ইমাম ইবনুল কাইয়িমের তো এ বিষয়ে বহু রচনা আছে। যেমন : *আদ-দাউ ওয়াদ দাওয়া* (الداء والدواء), *তারিকুল হিজরাতাইন* (طريق الهجرتين), *ইদ্দাতুস সাবিরীন ওয়া যাখীরাতুশ শাকিরীন* (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين), আর তাঁর রচিত সবচেয়ে বিখ্যাত গ্রন্থটি হলো– *মাদারিজুস সালিকীন শরহু মানাযিলুস সাইরিন ইলা মাকামাতি : ইয়্যাকা নাবুদু ওয়া ইয়্যাকা নাসতাঈন* (مدارج السالكين، شرح منازل السائرين إلى مقامات : إياك نعبد وإياك نستعين)। এ ছাড়াও আছে শাইখুল ইসলাম ইসমাঈল আল-হারাবি আল-হাম্বলি রচিত সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা 'আল-মানাযিল' (المنازل)। কিন্তু এ পুস্তিকায় তিনি অনেক ক্ষেত্রে শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়ার সাথে মতপার্থক্য করেছেন। তিনি বলেছেন– "শাইখুল ইসলাম আমাদের প্রিয় ব্যক্তিত্ব; কিন্তু হক কথা আমাদের কাছে তাঁর চেয়েও অধিক প্রিয়।"

ইবনু তাইমিয়া রহ. ও তাঁর ছাত্র ছিলেন অনেক উঁচু মাপের আল্লাহওয়ালা এবং সঞ্জীবিত হৃদয় ও পবিত্র অন্তরের অধিকারী। তাদের আত্মার সংযোগ ছিল উর্ধ্বজগতের সাথে। যখন ইবনুল কাইয়িম রহ.-কে কারাবন্দি করা হলো, এ বন্দিদশার কারণে তাঁর দৃঢ়চিত্তে সামান্যতম ফাটল ধরেনি এবং আল্লাহর সাথে তাঁর সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ভাটা পড়েনি। এ সময় ইবনুল কাইয়িম রহ. বলেন–

> "প্রকৃত বন্দি তো ওই ব্যক্তি, যার অন্তর তার রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে। আর কারাবন্দি তো ওই ব্যক্তি, যাকে তার প্রবৃত্তি বন্দি করে ফেলেছে।"

ইবনুল কাইয়িম রহ. বলতেন–

> "আমার শত্রুরা আমার কী আর ক্ষতি করবে? তারা যদি আমাকে জেলখানায় বন্দি করে, তাহলে সেই জেলখানা হবে আমার নির্জনাবাস। যদি তারা আমাকে দেশান্তর করে, তবে তা হবে আমার জন্য ভ্রমণবিলাস। আর যদি তারা আমাকে হত্যা করে, তবে তা হবে আমার জন্য শাহাদাত।"

আমার মনে হয়, কেউ যদি হাসান আল বান্নার জীবনচরিত এবং তাঁর চিন্তা ও দাওয়াতের বিষয়ে অনুসন্ধানী দৃষ্টি দেয়, তাহলে সে ধীরে ধীরে তাসাউফের নিকটবর্তী হতে থাকবে এবং সালাফের অনুসরণের অতি কাছাকাছি চলে যাবে। কেননা, ইমাম আল বান্না কখনও এ দুটিকে সাংঘর্ষিক মনে করেননি;

www.bjilibrary.com

বরং তিনি তাসাউফের আধ্যাত্মিকতার মধ্য দিয়ে সালাফদের অনুসরণের সুধা পান করেছেন। আর সালাফদের নীতিকে ধারণ ধরে তাসাউফের অর্জনকে সংরক্ষণ করেছেন। এ কারণে ইমাম বান্না অধিকাংশ অনুসারীর মধ্যেও এ দুটি গুণের প্রাবল্য ছিল।

সমাজদর্শনে ভারসাম্য

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াতে ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা প্রতিফলিত হওয়ার একটি ক্ষেত্র হলো সমাজের সাথে ইখওয়ানের সম্পর্ক। ইখওয়ান ও সমাজের পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ইমাম বান্নার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল মধ্যমপন্থি ও ভারসাম্যপূর্ণ। আর এই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে বিস্তৃত পরিসরে চিন্তা করে এবং তাতে এমন দূরবিনের সাহায্য গ্রহণ করে, যাতে ক্ষীণ আলোও অন্ধকারের সাথে মিলে যাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

বর্তমান সমাজ বিশুদ্ধ ইসলাম ও পূর্ণ ঈমানের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। স্বল্প জ্ঞানের অধিকারীরা এ কথা প্রচার করে যে, উম্মাহ বর্তমানেও পরিপূর্ণ কল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত; কেননা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারে তারা অগ্রসর হচ্ছে এবং বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে অগ্রসরতার মাধ্যমে সকল বাধাবিঘ্ন একসময় কেটে যাবে, সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।

এ ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিভিন্ন মুসলিম দেশের সমাজব্যবস্থা বিশ্বাস, চিন্তাচেতনা, চরিত্র ও ঐক্য প্রতিষ্ঠায় চরম ব্যাধির শিকার। বিভিন্ন ধরনের ফিতনা ও ফাসাদে জর্জরিত। মুসলিমদের বিবেক বিনষ্টের কারণে তাদের বিশ্বাস ও অনুভূতিও ক্ষীণ হয়ে গেছে। তাদের মননশীলতা বিনষ্টের কারণে তাদের চরিত্র ও কর্ম নষ্ট হয়ে গেছে। তাদের বিধান গ্রহণের ভিত্তি নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের শাসননীতি ও আইনকানুনে চরম বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। পারিবারিক বিশৃঙ্খলার কারণে স্বামী-স্ত্রী, পিতা-মাতা ও সন্তানদের সম্পর্কে ফাটল ধরেছে। মুসলমানদের সমাজ, অর্থনীতি ও রাজনৈতিক অঙ্গনের বিশৃঙ্খলা তাদেরকে বিশ্বের পশ্চাৎপদ জাতিতে পরিণত করেছে। অথচ একসময় তারাই ছিল বিশ্বের উন্নত, অগ্রসর ও নেতৃত্বদানকারী জাতি।

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এসব কিছু হলো ইসলামের বিশুদ্ধ চিন্তা ও ঈমানের বাস্তবিক প্রয়োগ থেকে বিচ্যুতির ফলাফল। এ অবস্থার সৃষ্টি না হলে মুসলিম সমাজে নতুন করে দাওয়াত প্রদানের কোনো প্রয়োজন হতো না;

www.bjilibrary.com

ইসলামের মর্মবাণীর সঠিক উপস্থাপন, ঈমানের পুনরুজ্জীবন এবং ইসলামি বিধান সুচারুরূপে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সঠিক দিক-নির্দেশনা ও প্রশিক্ষণের প্রয়োজনও হতো না; বরং এগুলো ধারাবাহিকভাবে বাস্তবায়িতই থাকত।

লক্ষণীয় বিষয় হলো– সমাজের এ সকল বিচ্যুতি ও বিশৃঙ্খলা সত্ত্বেও ইমাম হাসান আল বান্না কখনও এমন বলেননি যে, এটি জাহিলি সমাজ বা কাফির সমাজ। তিনি সমাজের বিশেষণ হিসেবে বিচ্যুতি, অন্যায়, পাপাচার ও বিদআতে লিপ্ত হওয়ার কথা বললেও কখনও কাফির বা মুরতাদের বিশেষণ ব্যবহার করতেন না। কেননা, মুসলিম সমাজে ইসলামের রীতিনীতিসমূহ সর্বদাই সজীব ছিল এবং ইসলামের কিছু বিধানের পরিপালন ও বাস্তবায়নও ছিল অব্যাহত। সমাজের অধিকাংশ লোক ছিল মহান রব, নবি ও কুরআনের প্রতি বিশ্বাসী। তাদের অন্তরে ঈমানি চেতনাবোধ ছিল সর্বদা বিরাজমান এবং ইসলামের বাণী সর্বদা তাদের মনে বপন করত জাগরণের বীজ।

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর অনুসারীদের এ শিক্ষায় গড়ে তুলেছেন যে, তারা যেন মুসলিমদের কাফির ঘোষণার কাজ থেকে বিরত থাকে; যেমন ইতঃপূর্বে খারিজি সম্প্রদায় করেছিল। কেননা, খারিজিরা নিজেদের ছাড়া বাকি সকল মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করে তাদের জীবন ও সম্পদ নিজেদের জন্য হালাল মনে করেছিল। এমনকি খারিজিদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এটাই হয়ে গিয়েছিল যে, তারা মুসলিমদের হত্যা করত এবং মূর্তিপূজারিদের ছেড়ে দিত!

ইমাম বান্না ওই সকল দলকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতেন, যারা একে অপরের প্রতি কুফরের তির তাক করে রাখে এবং শিরক ও ধর্মত্যাগের অভিযোগ দিতে ওতপেতে থাকে।

ইমাম বান্না 'বিশ মূলনীতি'র সর্বশেষ নীতিতে বলেন–

ولا نكفر مسلما أقر بالشهادتين وعمل بمقتضاها وأدى الفرائض. برأي أو بمعصية. إلا إن أقر بكلمة الكفر. أو أنكر معلوما من الدين بالضرورة. أو كذب صريح القرآن. أو فسره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال. أو عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر.

"আমরা এমন কোনো মুসলিমকে কাফির সাব্যস্ত করব না, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে, এ বিশ্বাসের দাবি অনুযায়ী কাজ করে এবং ফরজ বিধানগুলো পালন করে– হোক তা নিজের

www.bjilibrary.com

মর্জিমতো কিংবা অন্যায় কাজের মিশ্রণে। তবে কেউ যদি সুস্পষ্টরূপে কুফরের কথা স্বীকার করে অথবা দ্বীনের কোনো জরুরি বিষয়কে অস্বীকার করে কিংবা কুরআনকে সুস্পষ্টরূপে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে অথবা কুরআনের এমন ব্যাখ্যা করে– যার সাথে আরবি ভাষার নীতিমালার সামান্যতম সম্পর্ক নেই অথবা এমন কাজ করে, কুফর ছাড়া যার ভিন্ন কোনো সম্ভাবনা নেই– তাহলে ভিন্ন কথা।"

কোনো সমাজ এবং সেই সমাজের সদস্যদের কাফির ঘোষণার যে নীতি কোনো কোনো দ্বীনপ্রচারকারীগণ গ্রহণ করেছে, এটি মূলত বিভ্রান্তি এবং কার্যত ও আচরণগত ভুল। আমি আশাবাদী যে, এ বিষয়ে স্বতন্ত্র কোনো বইয়ে বিশদ আলোচনা করব, ইনশাআল্লাহ।[৮]

সমাজের সাথে ইখওয়ানের সম্পর্কের নীতিনির্ধারণে ইখওয়ান এ ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ইখওয়ান সমাজের স্রোতে ভেসে যাওয়া কিংবা 'উন্নয়ন' ও 'আধুনিকতা' ইত্যাদি শিরোনামে ভালো-মন্দ ও হালাল-হারামকে একাকার করে সমাজের সাথে তাল মিলিয়ে চলায় বিশ্বাস করে না; যেমনটি পশ্চিমা সভ্যতার প্রচারক ও মুসলিম সমাজে আধুনিকতার দাবিদাররা করে থাকে। অনুরূপ সমাজকে প্রত্যাখ্যান করা, তার ওপর কর্তৃত্ব করা বা তার সাথে বৈরীসুলভ আচরণ করা, কুঞ্চিত ভ্রু ও বিরক্তিভাব নিয়ে দূর থেকে সম্বোধন করা কিংবা নিজেকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করা বা বড়ো মনে করা ইত্যাদি বিষয়গুলোর ওপর ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠা হয়নি।

মূলত ইখওয়ানের প্রতিষ্ঠা হয়েছে সমাজের প্রতি গুরুত্ব প্রদান, সমাজের দুর্যোগ-দুর্বিপাকে পাশে দাঁড়ানো এবং সমাজের দুঃখ-বেদনায় অংশগ্রহণের ভিত্তির ওপর। এ কারণে ইখওয়ানের সদস্যরা সমাজের খুশিতে খুশি হয়, সমাজের কল্যাণে কাজ করে, সমাজ রক্ষা এবং সমাজ সংস্কারের জন্য চেষ্টা করে। সুতরাং ইখওয়ানের প্রত্যেক সদস্য নিজেকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ মনে করে; যেমন ভবনের একটি ইট তার অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে থাকে।

---

৮. এ বিষয়ে আরও বিস্তারিত জানতে পড়ুন উসতায ইউসুফ আল কারযাভীর রচিত বই 'তাকফির : কাফির ঘোষণায় বাড়াবাড়ি ও মূলনীতি'। বইটির অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে প্রচ্ছদ প্রকাশন থেকে; অনুবাদ করেছেন এনামুল হাসান আযহারি। –সম্পাদক

www.bjilibrary.com

নবিজি সা. মুসলিম সমাজের এ চিত্রই আমাদের জন্য তুলে ধরেছেন। যেমন, তিনি বলেছেন–

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"এক মুমিন অপর মুমিনের জন্য ভবনস্বরূপ, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" বুখারি : ২৪৪৬

مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ، وَتَرَاحُمِهِمْ، وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى.

"পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সমব্যথী হওয়ার ক্ষেত্রে মুমিনদের দৃষ্টান্ত হলো একটি দেহের মতো। তার একটি অঙ্গ আক্রান্ত হলে দেহের অন্য সকল অঙ্গ তার জন্য রাত্রিজাগরণ ও জ্বরে অংশগ্রহণ করে।" মুসলিম : ২৫৮৬

অপর এক হাদিসে রাসূল সা. বলেন–

مَنْ لَمْ يَهْتَمَّ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَلَيْسَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি মুসলিমদের কাজের বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না, সে তাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।" আল-মুজামুল আওসাত লিত তাবারানি : ৭৪৭৩

এসব নির্দেশিকার কারণে ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সদস্যরা হয় দেশপ্রেমী। দখলদার বাহিনী থেকে দেশকে স্বাধীন করতে এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতিবন্ধক সকল প্রকার পরাধীনতার শিকল থেকে দেশকে মুক্ত করতে ইখওয়ানের সদস্যরা সদা তৎপর।

শহিদ হাসান আল বান্না তাঁর دعوتنا في طور جديد পুস্তিকায় বলেন–

"আমরা এ পবিত্র ভূখণ্ডের অধিবাসী হিসেবে মিশরি, যেখানে আমাদের জন্ম ও বেড়ে ওঠা। মিশর একটি মুসলিম দেশ, যা সাগ্রহে ইসলাম গ্রহণ করেছে এবং ইসলাম থেকে নিজের পাথেয় সংগ্রহ করেছে। ইতিহাসের কালপরিক্রমায় বহুবার ইসলামের শত্রুদের প্রতিহত করেছে মিশর। এই দেশের সন্তানেরা নিষ্ঠার সাথে ইসলামের কল্যাণে কাজ করেছে এবং সর্বোচ্চ আবেগ-অনুভূতির সাথে ইসলামকে আপন করে নিয়েছে।

www.bjilibrary.com

মিশরের ভূমির জন্য ইসলামই একমাত্র উপযুক্ত ধর্ম। ইসলামের চিকিৎসা ব্যতীত মিশরের সুস্থতা অসম্ভব। আর ইসলামের ওষুধ ব্যতীত মিশরের আরোগ্য লাভও অসম্ভব। বস্তুত পারিপার্শ্বিক বহু পরিস্থিতির কারণে মিশর ইসলামি চিন্তার লালন ও প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। তাহলে কেনই-বা আমরা মিশর ও মিশরের মানুষের কল্যাণে কাজ করব না? কেনই-বা মিশরকে বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে প্রতিহত করব না? এটাই যখন বাস্তবতা, তখন এ কথা বলা কীভাবে সঠিক হতে পারে যে– 'মিশরবাসীর মধ্যে ইসলাম প্রচারের জন্য ঈমান ও আবশ্যিক গুণাবলির সমাবেশ নেই!'

আমরা এজন্য গর্বিত যে, আমাদের প্রিয় দেশের জন্য আমরা নিবেদিতপ্রাণ। দেশের কল্যাণের নিমিত্তে প্রাণপণ চেষ্টাকারী। আমরা যতদিন বেঁচে থাকব এ চেষ্টা চালিয়ে যাব। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের এ চেতনা কাঙ্ক্ষিত বিপ্লবের প্রথম ধাপ এবং এই মিশর বৃহৎ আরব ভূখণ্ডের একটি অংশ। সেইসাথে মিশরের কল্যাণে কাজ করা মানে আরব, প্রাচ্য ও ইসলামের কল্যাণে কাজ করা।

আমরা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস, সভ্যতা ও নগর বিনির্মাণে মিশরের পূর্ববর্তীদের অবদান এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যে তাদের অনন্য কীর্তির স্বীকৃতি প্রদানে মোটেও কার্পণ্য করব না।

আমরা স্বাগত জানাই প্রাচীন মিশরকে, যার আছে সমৃদ্ধ ইতিহাস, মর্যাদা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানে অনন্য অবদান। অতএব, আল্লাহ তায়ালা মিশরকে যে ইসলামের শিক্ষা দ্বারা পথ দেখিয়েছেন, মিশরের বক্ষকে উন্মোচিত করেছেন, মিশরের অন্তর্দৃষ্টিকে আলোকোজ্জ্বল করেছেন, মিশরের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন এবং মিশরের ইতিহাসের সাথে মূর্তিপূজার পঙ্কিলতা, শিরকের আবর্জনা ও জাহিলি যুগের যে স্বভাব ও রীতি জড়িয়ে ছিল, সেসব থেকে মুক্ত করেছেন। এসব সত্ত্বেও যারা মিশরকে পঙ্কিল যুগে ফিরিয়ে নিতে চায় এবং মিশরের ইতিহাসে কালিমা লেপন করতে চায়, আমরা আমাদের সবটুকু শক্তি দিয়ে তাদের বিরোধিতা করি।"

এ চমকপ্রদ ও আলোকোজ্জ্বল কথাগুলো ইমাম হাসান আল বান্নার দাওয়াত ও শিক্ষার ক্ষেত্রে ভারসাম্য, মধ্যপন্থা ও বাস্তবতার একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক কারণেই দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে ইমাম বান্নার অবস্থান বিশেষভাবে আলোচনার দাবি রাখে।

www.bjilibrary.com

দেশপ্রেম ও জাতীয়তার বিষয়ে ভারসাম্য

ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর অনুসারীদের যে ভারসাম্যের শিক্ষা দিয়ে গড়ে তুলেছেন, তার একটি বহিঃপ্রকাশ হলো– তাঁর দাওয়াতি মিশন শুরুর প্রাক্কালে মিশরে বিদ্যমান অন্যান্য দল ও মতাদর্শের প্রতি তাঁর অবস্থান। ইমাম বান্না জাতীয়তাবাদ, আরববাদ, প্রাচ্যবাদ বা বিশ্বায়ন ইত্যাদি চিন্তাধারাগুলোকে সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করে সংঘর্ষে জড়াতেন না, আবার তিনি এগুলোকে অকপটে গ্রহণও করতেন না; বরং তিনি ইসলামি চিন্তার সাথে সংগতিপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক এই ভিত্তিতে সেগুলোর মধ্যে বিভাজন করতেন। সংগতিপূর্ণ অংশটুকু গ্রহণ করে সাংঘর্ষিক অংশটুকু প্রত্যাখ্যান করতেন।

দেশের প্রতি ভালোবাসা মানবপ্রকৃতির অংশ

ইমাম হাসান আল বান্না دعوتنا (আমাদের আহ্বান) পুস্তিকায় জাতীয়তাবাদের দাবিদারদের বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন–

> "জাতীয়তাবাদের দাবিদাররা যদি এর দ্বারা এ ভূখণ্ডের প্রতি তাদের প্রেম, ভালোবাসা, আকর্ষণ ও অনুরাগ ইত্যাদি বোঝায়, তাহলে আমরা বলব– এ বিষয়টি একদিক থেকে যেমন মানবপ্রকৃতির মধ্যে গেঁথে আছে, অনুরূপ অপরদিক থেকে ইসলামেও তার আদেশ করা হয়েছে।"

সাইয়িদুনা বিলাল রা., যিনি স্বীয় আকিদা-বিশ্বাস ও দ্বীনের পথে তাঁর সবকিছু উৎসর্গ করেছেন, তিনি তাঁর জন্মভূমি হিজরতের নগরী মক্কার প্রতি নিজের আকর্ষণ ও প্রেমের ঘোষণা দিয়ে কিছু কবিতা আবৃত্তি করেছেন, যা অনুভূতিশীল অন্তরে প্রেমের মিষ্টি ভাবাবেগ তৈরি করে অশ্রু প্রবাহিত করে–

أَلَا لَيْتَ شِعْرِي هَلْ أَبِيتَنَّ لَيْلَةً ... بِوَادٍ وَحَوْلِي إِذْخِرٌ وَجَلِيلُ

وَهَلْ أَرِدَنْ يَوْمًا مِيَاهَ مَجَنَّةٍ ... وَهَلْ يَبْدُوَنْ لِي شَامَةٌ وَطَفِيلُ

হায়! যদি আমি একটি রাত্রি যাপন করতাম–
যে উপত্যকায়, আমার পাশে থাকবে ইযখির ও জলিল ঘাস।
আমি কি যেতে পারব একটি দিনের জন্য উন্নত্ততার সেই ঘাটে–
আমার সামনে কি প্রতিভাত হবে শামাহ ও তাফিল পাহাড়!

www.bjilibrary.com

হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, একদিন আল্লাহর রাসূল সা. আসিল গিফারি রা.-এর মুখ থেকে মক্কার কাব্যিক বিবরণ শুনে ভাবাবেগে অশ্রুসিক্ত হলেন এবং বললেন– يا أصيل... دع القلوب تقر –'হে আসিল, অন্তরকে শান্ত হতে দাও'।[৯]

স্বাধীনতার প্রশ্নে জাতীয়তাবাদ

আর যদি জাতীয়তাবাদ পরিভাষা দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয়, দখলদারদের থেকে দেশকে স্বাধীন করা, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা এবং দেশের সন্তানদের অন্তরে স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদার বীজ বপন করা, তাহলে এক্ষেত্রে আমরাও তাদের সাথে আছি। ইসলামও এ ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বারোপ করেছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٨﴾

"শক্তি ও সম্মান তো আল্লাহর জন্য এবং তাঁর রাসূলের ও মুমিনদের জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।" সূরা মুনাফিকুন : ৮

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٤١﴾

"নিশ্চয় আল্লাহ কখনও মুমিনদের বিরুদ্ধে কাফিরদের জন্য কোনো পথ খোলা রাখবেন না।" সূরা নিসা : ১৪১

ঐক্যের জন্য জাতীয়তা

আর জাতীয়তার দ্বারা যদি তাদের উদ্দেশ্য হয়, নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ঐক্যকে মজবুত করা, নিজেদের কল্যাণে এ শক্তিকে ব্যবহার-উপযোগী করা, তাহলে এক্ষেত্রে আমরাও তাদের সাথে সহমত পোষণ করি। ইসলাম এ বিষয়টিকে আবশ্যিক বিধান হিসেবে গণ্য করে। যেমন, নবিজি সা. বলেছেন–

وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا

"আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে যাও।" বুখারি : ৬০৬৪

---

৯. হাদিসটি ইবনু আবিদ দুনিয়া রচিত *'আল-মাতার ওয়াল ওয়াদ ওয়াল বারাক'* (হাদিস নং : ৮০) গ্রন্থে এবং ইবনুল আযরাকি রচিত *'আখবারু মাক্কাহ'য়* (খ. ২, পৃ. ১৫৫) এ শব্দে বর্ণিত হয়েছে– حَسْبُكَ يَا أَصِيلُ لَا تُحْزِنَّا (হে আসিল! যথেষ্ট হয়েছে; আমাদেরকে আর ব্যথিত করো না।)

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআন মাজিদে বলেন–

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَتَّخِذُوا۟ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا...﴾ ١١٨

"হে মুমিনগণ! তোমরা নিজেদের বাইরে থেকে কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোনো ত্রুটি করবে না।" সূরা আলে ইমরান : ১১৮

বিজয়ের জন্য জাতীয়তা

যদি জাতীয়তাবাদ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য হয়, বিভিন্ন অঞ্চল বিজয় এবং ভূপৃষ্ঠের নেতৃত্ব লাভ করা, তাহলে আমরা বলব– এটি ইসলামের একটি ফরজ বিধান। নিশ্চয় ইসলাম বিজেতাদের সর্বোত্তম উপনিবেশ ও সবচেয়ে বরকতময় বিজয়ে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلُّهُۥ لِلَّهِ...﴾ ٣٩

"তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে, যতক্ষণ-না বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।" সূরা আনফাল : ৩৯

দলীয়করণের জন্য জাতীয়তাবাদ

আর যদি জাতীয়তাবাদ দ্বারা তাদের উদ্দেশ্য বা কার্যক্রমের ফলাফল– উম্মতকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে তাদের মধ্যে হিংসা-বিদ্বেষ ও বিবাদ-লড়াই জিইয়ে রাখার আয়োজন করা। তাদের একে অপরের শত্রুতে পরিণত করা, যারা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য আইন প্রণয়ন করবে এবং ব্যক্তিস্বার্থকে বৃহৎ স্বার্থের ওপর প্রাধান্য দেবে। আর শত্রুপক্ষ একে মোক্ষম সুযোগ হিসেবে ব্যবহার করবে। এ নারকীয় অগ্নির তাণ্ডব ক্রমশই বৃদ্ধি পাবে, যা তাদেরকে হকের পথে শতধা বিভক্ত করবে এবং বাতিলের পক্ষে একতাবদ্ধ করবে। পারস্পরিক সম্পর্ক ও সহযোগিতাকে হারাম করবে, শুধু দলীয় লোকদের সাথে মিলিত হবে এবং কেবল তাদের নিয়েই কাজ করবে, যেখানে বিপক্ষ মতের বা বিপক্ষ দলের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগ থাকবে না। এভাবে সকলেই ধীরে ধীরে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাবে। এমন দলীয় জাতীয়তাবাদের জবাবে আমরা বলব, এটি হচ্ছে একটি মন্দ জাতীয়তাবাদ– যাতে কোনো কল্যাণ নেই।

www.bjilibrary.com

আপনি ইতঃপূর্বেই লক্ষ করেছেন যে, জাতীয়তাবাদের দাবিদারদের সাথে দেশ ও জনগণের কল্যাণে তাদের যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা, এর সাথে আমরা একমত। অবশ্য আপনি এ বিষয়ও অবগত আছেন যে, জাতীয়তাবাদের ওই সুদীর্ঘ দাবি ইসলামি শিক্ষারই একটি অংশ।

আমাদের জাতীয়তাবাদের সীমারেখা

আমাদের ও তাদের মধ্যে পার্থক্য হলো– আমরা জাতীয়তাবাদের সীমারেখা নির্ধারণ করি আকিদা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে, আর তারা এর সীমারেখা নির্ধারণ করে নির্দিষ্ট ভূখণ্ড ও ভৌগোলিক সীমারেখার ভিত্তিতে। যেখানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' বলার মতো কোনো মুসলিম আছে, এমন প্রত্যেক ভূখণ্ডই আমাদের দেশ। সেই ভূখণ্ডের প্রতি রয়েছে আমাদের সম্মান, ভালোবাসা, নিষ্ঠা এবং তার পবিত্রতা রক্ষা ও কল্যাণ নিশ্চিত করতে আমরা সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত। এ সকল ভৌগোলিক সীমারেখা ও অঞ্চলে বসবাসরত সকল মুসলিম যেন আমাদের পরিবারভুক্ত এবং তারা আমাদের ভাই। আমরা তাদের বিষয়ে যত্নশীল, তাদের সুখ-দুঃখ, আবেগ ও অনুভূতিতে সমভাবে অংশীদার। কিন্তু প্রচলিত জাতীয়তাবাদের দাবিদাররা এ চেতনা পোষণ করে না। তারা শুধু নির্দিষ্ট ও সংকীর্ণ ভূখণ্ডের ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদান করে।

আমাদের ও তাদের মধ্যকার আরেকটি পার্থক্য হলো, তারা কোনো মুসলিম ভূখণ্ডের বিপক্ষেও শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করতে চায়, কিন্তু আমরা এটিকে সমর্থন করি না। বরং আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে, সকল মুসলিমের পক্ষে সক্ষমতা অর্জন। কিন্তু নিছক জাতীয়তাবাদের দাবিদাররা এ বিষয়ে চিন্তা করে না। এ কারণেই দেখা যায়– মুসলিমদের পারস্পরিক সম্পর্কের অবনতি ঘটে, তাদের শক্তি খর্ব হয় এবং এতে করে শত্রুরা মুসলিমদের ওপর পৃথক পৃথকভাবে আক্রমণের সুযোগ পায়।

আমাদের জাতীয়তাবাদের উদ্দেশ্য

দেশীয় জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে প্রধান লক্ষ্য হলো, তাদের দেশকে ঔপনিবেশিকদের কবল থেকে মুক্ত করা। নিজেদের দেশকে অন্যদের তুলনায় শ্রেষ্ঠত্বের জায়গায় নিয়ে যেতে সর্বাত্মক চেষ্টা করা। এ লক্ষ্যে তারা নিজেদের শক্তি সঞ্চয় করে, যেমনটি জাগতিক দিক থেকে বর্তমান ইউরোপ করছে।

www.bjilibrary.com

কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, মুসলিমদের কাঁধে রয়েছে আরও বৃহৎ ও বিশাল আমানত। সেই আমানত আদায়ে তার নিজের জীবন ও সম্পদ আল্লাহর রাহে ব্যয় করা কর্তব্য। এ আমানতটি হচ্ছে, ইসলামের জ্যোতি ছড়িয়ে দিয়ে মানবজাতিকে আল্লাহর সন্তুষ্টির পথের সন্ধান দেওয়া এবং ভূপৃষ্ঠের সমগ্র অঞ্চল জুড়ে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করা। যেখানে ধনসম্পদ, পদপদবি, প্রভাব-প্রতিপত্তি এবং কোনো জাতিকে নিজের অনুগত বানানো ইত্যাদি বা এ জাতীয় কোনো কিছু উদ্দেশ্য হবে না; বরং লক্ষ্য হবে কেবল এক আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং দ্বীনের প্রসার ও তার কালিমাকে সমুন্নত করার মাধ্যমে এ ধরাকে সৌভাগ্যমণ্ডিত করা। এ পবিত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্যই পূর্বসূরিগণকে কালজয়ী বিজয়ে তাড়িত করেছে, যা হতবাক করে দিয়েছে পুরো বিশ্বকে। আর এর দ্রুতময়তা, সাম্য, আভিজাত্য ও মহত্ত্ব ইতিহাসের গতিপথে যোগ করেছে নতুন এক মাত্রা।

দাওয়াতি কাজে মানুষের শ্রেণিকরণে ভারসাম্য

ইখওয়ানুল মুসলিমিন দাওয়াতের সুবিধার্তে উদ্দিষ্ট জনতাকে ভারসাম্যপূর্ণভাবে শ্রেণিকরণ করে এবং প্রত্যেক শ্রেণিকে তার উপযোগী সর্বোত্তম পদ্ধতিতে দাওয়াত দেয়।

এক. মুমিন ব্যক্তি, যে দাওয়াতের কাজে বিশ্বাস করে এবং দাওয়াতের প্রাথমিক কার্যক্রমগুলো তাকে মুগ্ধ করে। এতে অংশগ্রহণকে সে নিজের জন্য কল্যাণকর মনে করে এবং তাতে প্রশান্তি অনুভব করে। আমরা এমন ব্যক্তিকে আমাদের সাথে কাজে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানাব, যাতে মুজাহিদদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং দ্বীনের পথে আহ্বানকারীদের আওয়াজ সমুন্নত হয়। কেননা, আমলবিহীন ঈমান পরিপূর্ণ হয় না। যেমন– যে বিশ্বাস ব্যক্তিকে তার দাবি পূরণ এবং দ্বীনের পথে আত্মত্যাগে তাড়িত করে না, তা অনেকটাই নিষ্ফল।

দুই. দ্বিধান্বিত ব্যক্তি, যার সামনে কোনো পথ স্পষ্ট নয়। আমাদের কথায় নিষ্ঠা ও উপকারিতা সম্পর্কে যে অবগত হয়নি। এমন ব্যক্তি মূলত দ্বিধান্বিত হয়ে নিজ গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে আছে। এ শ্রেণির লোকদের জন্য ইমাম হাসান আল বান্নার নির্দেশনা হলো– 'সে যেন আমাদেরকে কাছ থেকে যাচাই করে দেখে, কাছে বা দূরে থেকে আমাদের বিষয়ে পড়াশোনা করে, আমাদের রচনাগুলো

www.bjilibrary.com

পাঠ করে, আমাদের সভা-সমাবেশগুলোতে উপস্থিত হয় এবং ইখওয়ানের সদস্যদের সাথে পরিচিত হয়। এভাবে কাজ করলে আমাদের ব্যাপারে আশ্বস্ত হতে পারবে, ইনশাআল্লাহ!

তিন. নিছক সুবিধাভোগী। জাগতিক স্বার্থ ও বিনিময় ছাড়া যে কোনোকিছু ব্যয় করতে রাজি নয়। আল্লাহ তায়ালা যদি এ শ্রেণির লোকের অন্তর থেকে অন্ধত্বের পর্দা সরিয়ে দেন এবং তার হৃদয় থেকে লোভের দুঃস্বপ্ন দূর করে দেন, তাহলে সে বুঝতে সক্ষম হবে যে, আল্লাহর কাছে যে বিনিময় রয়েছে, তা অধিকতর উত্তম ও স্থায়ী। এ কথা বুঝতে সক্ষম হলে সে তার জাগতিক সম্পদ ও সামর্থ্য ব্যয়ের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আল্লাহর বাহিনীতে শরিক হয়ে যাবে এবং পরকালে আল্লাহর নিকট থেকে এর পূর্ণ প্রতিদান লাভ করবে। কিন্তু যদি এর ব্যতিক্রম হয়, তাহলে সে যেন জেনে রাখে– নিশ্চয় আল্লাহ ওই ব্যক্তি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, যে তার জীবন, সম্পদ, দুনিয়া, আখিরাত এবং হায়াত ও মওতে আল্লাহ তায়ালার হক আছে বলে বিশ্বাস করে না।

চার. যে ব্যক্তি আমাদের ব্যাপারে ভুল ধারণার শিকার। ফলে আমাদের ব্যাপারে মন্দ ধারণা করে। নানা প্রকার সন্দেহ ও সংশয় তাকে ঘিরে রাখে। সে আমাদেরকে কেবল নিকষকালো চশমা দ্বারাই দেখে এবং আমাদের ব্যাপারে শুধু সন্দেহ পোষণকারী ও সমালোচনাকারীর ভাষায় আলোচনা করে।

আমরা আমাদের ও তার জন্য হিদায়াত ও সঠিক পথ লাভের দুআ করি। এ শ্রেণির লোকজনকে আমরা ভালোবাসব এবং আমাদের প্রতি তার নেকদৃষ্টি এবং আমাদের দাওয়াতের প্রতি তার সন্তুষ্টি কামনা করব। তার জন্য আমাদের নিবেদন হবে, যেমনটি মুসতফা সা. বলেছিলেন–

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ.

"হে আল্লাহ! আপনি আমার কওমকে ক্ষমা করুন। কারণ, তারা জানে না।" বুখারি : ৩৪৭৭

এমন উদার মন ও পবিত্র আত্মা এবং বিশাল হৃদয় ও সুন্দর নীতিতে ইমাম হাসান আল বান্না তাঁর সমাজের আশপাশের লোকদের প্রতি দৃষ্টিপাত করতেন এবং দাওয়াতি কাজে তাদের অবস্থান, সেইসাথে তাদের ব্যাপারে নিজের অবস্থান নির্ধারণ করতেন। এমন সুস্পষ্ট অবস্থানকে ভারসাম্য বলা হয়।

***

www.bjilibrary.com

পঞ্চম অধ্যায়

ভ্রাতৃত্ব ও একতা

আমাদের দাওয়াতের অন্যতম ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াতের মৌলিক ও তাৎপর্যমণ্ডিত দিক হচ্ছে, ভ্রাতৃত্ব এবং আল্লাহর জন্য একে অপরকে মহব্বত। স্বয়ং 'ইখওয়ান' নামের মধ্যেই তো ভ্রাতৃত্বের গুণ নিহিত আছে। ইমাম হাসান আল বান্না এ ভ্রাতৃত্বকে বাইয়াতের দশটি রুকন (মৌলিক অংশ)-এর একটি স্থির করেছেন এবং তাকে এভাবে ব্যক্ত করেছেন–

"অন্তর ও রুহসমূহ বিশ্বাসের বন্ধনে আবদ্ধ হবে। নিশ্চয় বিশ্বাসের বন্ধনই হচ্ছে সবচেয়ে মজবুত ও সর্বোন্নত বন্ধন। আর ভ্রাতৃত্ব হচ্ছে ঈমানের সহোদর এবং বিচ্ছিন্নতা হচ্ছে কুফরের সহোদর। শক্তিমত্তার ন্যূনতম স্তর হচ্ছে একতার শক্তি। আর ভালোবাসা ছাড়া তো একতা হতে পারে না। ভালোবাসার ন্যূনতম পরিমাণ হচ্ছে, অন্তর হিংসা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হওয়া। আর সর্বোচ্চ স্তর হচ্ছে, নিজের ওপর অন্যকে প্রাধান্য দেওয়া। আল্লাহ তায়ালা বলেন–

...وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُولَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾

'অন্তরের কার্পণ্য থেকে যাদের মুক্ত রাখা হয়েছে, তারাই সফলকাম।' সূরা হাশর : ৯

ইখওয়ানের সত্যিকারের সদস্য সব সময় অন্য সদস্যদের নিজের ওপর অগ্রাধিকার দিতে চেষ্টা করে। কারণ, তারা যদি নিজেদের অঙ্গনেই অপরকে অগ্রাধিকার দিতে না পারে, তাহলে অন্যদের বেলায়ও দিতে পারবে না। তারা যদি নিজেদের লোকদের সাহায্য করতে না পারে, তাহলে স্বভাবতই অন্যদেরও করতে পারবে না। এজন্য বলা হয়, ওই বকরি নেকড়ের আক্রমণের শিকার হয়, যে দলছুট হয়ে যায়।

www.bjilibrary.com

আল্লাহ তায়ালা বলেন–

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنٰتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاۤءُ بَعْضٍ...﴾(٧١)

'মুমিন মুমিনাগণ একে অপরের সহযোগী।' সূরা তাওবা : ৭১"

ইমাম হাসান আল বান্নাকে আমি বলতে শুনেছি–

"আমাদের দাওয়াত তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত– সূক্ষ্ম চিন্তা, দৃঢ় ঈমান ও গভীর মহব্বত।"

শাইখ বান্না সংগঠনের সাধারণ কেন্দ্রের সাপ্তাহিক আলোচনায় উৎসাহমূলক উদ্বোধনী আলোচনা করতেন। এ আলোচনার শিরোনাম ছিল حديث الثلاثاء (মঙ্গলবারের বার্তা)। এতে তিনি সংগঠনের সদস্যদের পারস্পরিক বন্ধনকে শক্তিশালী করার প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। পাশাপাশি তিনি আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক মজবুতির সমর্থনে কুরআন ও হাদিসের বিভিন্ন বাণী এবং পূর্বসূরিদের ঘটনাবলি শোনাতেন। তিনি এই আলোচনার নাম দেন عاطفة الثلاثاء (মঙ্গলবারের অনুভূতি)।

এ কারণে দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সকলেরই সেই দৃঢ় সম্পর্কের ব্যাপারে সম্যক ধারণা ছিল, যা ইখওয়ানের সদস্যদের একতাবদ্ধ করতে সক্ষম। সুতরাং তারাই হচ্ছে এ হাদিসের বাস্তব প্রমাণ, যেখানে বলা হয়েছে–

اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا

"এক মুমিনের সাথে অপর মুমিনের সম্পর্ক ইমারতস্বরূপ, যার একটি অংশ অপর অংশকে শক্তিশালী করে।" বুখারি : ২৪৪৬

অতএব, মুমিনরা পারস্পরিক সম্প্রীতি, সহানুভূতি ও সমব্যথী হওয়ার ক্ষেত্রে একই পরিবারের সন্তানদের ন্যায়। উপরন্তু বলা যায়, একই দেহের বিভিন্ন অঙ্গের ন্যায়।

এক সাংবাদিক ইখওয়ানের এ মজবুত বন্ধন দেখে একটি মন্তব্য করেছিলেন, যা পরবর্তীকালে ব্যাপক প্রসিদ্ধি লাভ করে। উক্তিটি হলো–

"এরা এমন সংগঠন গড়ে তুলেছে, যাদের একজন আলেকজান্দ্রিয়ায় হাঁচি দিলে আসওয়ানে অবস্থানকারী অপর সদস্য তার জবাবে বলে– ইয়ারহামুকাল্লাহ!"

www.bjilibrary.com

এভাবে মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী– জাতিগোষ্ঠী, ভাষা, স্তর ও বর্ণবৈষম্য ইত্যাদি সকল বাধা ও প্রতিবন্ধকতা দূরীভূত করে মানুষকে ইসলামের পরিচয় ও ভ্রাতৃত্বে একতাবদ্ধ করেছে ইখওয়ানুল মুসলিমিন। এজন্য কবি বলেন–

أبي الإسلام لا أب لي سواه ** إذا افتخروا بقيس أو تميم

"যখন তারা কায়েস ও তামিম গোত্রীয় হওয়ার কারণে গর্ব করে তখন আমি বলি– ইসলামই আমার আসল পরিচয়। ইসলাম ভিন্ন আমার কোনো পরিচয় নেই।"

ইখওয়ানের কর্মশালাগুলোতে আপনি লক্ষ করবেন– প্রকৌশলী, সরকারি কর্মকর্তা, ডাক্তার, হাসপাতালের কর্মকর্তা-কর্মচারী, শিক্ষক, কৃষক, অভিজাত বংশীয়, খ্যাতিমান লোকজন, বৃদ্ধ ও যুবকসহ নানা শ্রেণি, পেশা ও বয়সের লোকজন উপস্থিত থাকেন। তাদের মধ্যে কেবল ভ্রাতৃত্বের বন্ধনই দেখতে পাবেন। এক্ষেত্রে আল্লাহর রাসূল সা.-এর সাহাবাগণ আমাদের জন্য অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত; যদিও তাদের মধ্যে জাতি, ভাষা, বর্ণ, বংশপরিচয় ও সামাজিক মর্যাদায় বিস্তর ফারাক ছিল, কিন্তু হৃদয়গুলো ছিল কাছাকাছি। মহান আল্লাহর বাণী চিরন্তন সত্য। তিনি বলেছেন–

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ...﴾ (١٠)

"নিশ্চয় মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই।" সূরা হুজুরাত : ১০

কায়রোতে অবস্থিত ইখওয়ানুল মুসলিমিনের সাধারণ কার্যালয়টি ছিল বিশ্ব মুসলিমের এমন মিলনমেলা, যেখানে জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ একত্র হতে পারত। তাদের মধ্যে দৃঢ় বন্ধন, তাকওয়া ও ইসলামের পরিচয়ের বাইরে কোনো পার্থক্য বাকি থাকত না।

সেখানে আরব-অনারব, আফ্রিকান-এশিয়ান, সিরিয়ান-মরোক্কান, শ্বেত-কালো, হলুদ-লাল ইত্যাদি সকল বর্ণের মানুষের সম্মিলন ঘটত। বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের আগমন হতো। তাদের ভাষায় ছিল নানা বৈচিত্র্য। অনেক সময় দেখা যেত, তাদের দুই দেশের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক বিরাজ করছে। কিন্তু এখানে ইখওয়ানের কার্যালয়ে এসে তারা যেন ঈমানের সুবাদে সহোদর ভাইয়ের মতো এক পরিবারভুক্ত হয়ে যেত।

www.bjilibrary.com

তাদের মধ্যে অনেকে এমনও ছিল যে, তারা ইখওয়ানের সাথে মিশে যেন মিশরি হয়ে গিয়েছিল; অথচ বংশীয় দিক থেকে তারা হয়তো আফগানি, ইরাকি, হিন্দুস্তানি বা অন্য কোনো জাতিগোষ্ঠীর সদস্য।

তাদের মধ্য হতে যাদের কথা উল্লেখ না করলেই নয়। যেমন– আবদুল্লাহ আল-আকিল, হারুন আল-মুজাদ্দিদি, মুহাম্মাদ মুসতফা আল-আযমি প্রমুখ। তাদের মধ্য হতে শেষোক্ত দুজন মিশরের অন্যান্য সদস্যের সাথে ১৯৫৪ সালে কারাবন্দি হন এবং অবর্ণনীয় শাস্তি ভোগ করেন। ভিন্ন জাতির হওয়া সত্ত্বেও নাসেরের ভয়ানক জুলুম থেকে তারা রেহাই পাননি।

ইসলামের একজন বড়ো দাঈ ও প্রচারক ড. মুসতফা আস-সিবাঈ রহ. আমাকে একদিন বলেছিলেন, তিনি প্যারালাইসিসে আক্রান্ত হওয়ার পর শেষ কয়েক বছরে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিকিৎসার জন্য গেছেন। তিনি বিমান থেকে অবতরণ করেই দেখতেন, বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা তাকে স্বাগত জানাতে অপেক্ষমাণ। তারা তাঁর জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুর ব্যবস্থা করে রেখেছে এবং সবকিছু তাঁর প্রত্যাশার চাইতেও বেশি করেছে। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন–

> "আল্লাহর শপথ! তাদের সাথে আমার কোনো পূর্বপরিচয় ছিল না। ইতঃপূর্বে না আমার সাথে তাদের কোনো সাক্ষাৎ হয়েছে, আর না তাদের সাথে আমার কোনো সাক্ষাৎ হয়েছে। বরং এটা ছিল ঈমানি ভ্রাতৃত্ব ও দাওয়াতি সম্পর্ক। আল্লাহর আমাদেরকে এর সমূহ বরকত থেকে বঞ্চিত না করুন। তাদের কাজ দেখে আমার মনে হলো– তারা যেন আমার দীর্ঘদিনের পুরোনো বন্ধু।"

ভ্রাতৃত্ব আল্লাহর বড়ো নিয়ামত

কোনো সন্দেহ নেই যে, আল্লাহর জন্য ভ্রাতৃত্ব, তাঁর তরে মহব্বত এবং তাঁর দ্বীনের খাতিরে সম্পর্ক– এটি ঈমানের নিয়ামতের মধ্যে বান্দার প্রতি আল্লাহর বড়ো নিয়ামত। বরং বলতে গেলে– এ নিয়ামত ঈমানেরই একটি ফলাফল। যেমন, আল্লাহ তায়ালা মদিনার মুমিনদের সম্বোধন করে বলেছেন–

...وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا...﴿١٠٣﴾

www.bjilibrary.com

"তোমরা স্মরণ করো তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহকে। একসময় তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করেছেন, ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেছ।" সূরা আলে ইমরান : ১০৩

আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করেছেন, স্বীয় রাসূলকে সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন–

...هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ وَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ ۭ لَوْ اَنْفَقْتَ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيْعًا مَّآ اَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ اَلَّفَ بَيْنَهُمْ ۭ اِنَّهٗ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ﴿٦٣﴾

"তিনি আপনাকে স্বীয় সাহায্য ও মুমিনদের দ্বারা শক্তিশালী করেছেন এবং তিনি তাদের পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করলেও আপনি তাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতেন না; কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। নিশ্চয় তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।" সূরা আনফাল : ৬২-৬৩

আমি এমন অনেক ব্যক্তি ও দলের ব্যাপারে জানি, যাদের মধ্যে মহব্বত ও ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এটি ছিল নিছক জাগতিক স্বার্থে এবং এ কারণে সেই সম্পর্ক বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। কেননা, তারা তো নিজেদের জাগতিক স্বার্থ ও কামনা-বাসনা পূরণ করার জন্য মিলিত হয়েছে। যখন তাদের স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেছে অথবা প্রয়োজন পূরণ হয়ে গেছে কিংবা স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটেছে, তখন তাদের সম্পর্কে চিড় ধরেছে। তাদের পূর্বের সম্প্রীতি বৈরিতা ও বিবাদে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু আল্লাহর জন্য মহব্বত এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কেননা, আল্লাহর সত্তার চিরস্থায়িত্বের মতো এ সম্পর্কও স্থায়ী। এ কারণে বলা হয়–

"আল্লাহর জন্য সম্পর্ক হলে তা মজবুত ও স্থায়ী হয় এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও জন্য সম্পর্ক হলে তা দুর্বল ও অস্থায়ী হয়।"

এ ভ্রাতৃত্ব সবচেয়ে জোরালো হয়েছিল, নবযৌবনের মতো শক্তিমত্তা লাভ করেছিল বিপদ ও দুর্যোগের সময়গুলোতে। তখন সকল সম্পর্কের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছিল। কেননা, বিপদের সময় চেনা যায়– কে প্রকৃত বন্ধু, আর কে বন্ধুত্বের ভানকারী চাটুকার?

www.bjilibrary.com

এ কারণে কথায় আছে– বিপদে বন্ধুর পরিচয়! কবির ভাষায়–

جزا الله الشدائد كل خير ** عرفت بها عدوي من صديقي

"আল্লাহ তায়ালা বিপদাপদকে সর্বোত্তম বদলা দান করুন। কেননা, তার মাধ্যমেই আমি আমার বন্ধু ও শত্রু শনাক্ত করতে পেরেছি।"

আলী রা. থেকে বর্ণিত আছে–

وَلاَ خَيْرَ فِي وِدِّ امْرِئٍ مُتَلَوِّنٍ ** إِذَا الرِّيحُ مَالَتْ مَالَ حَيْثُ تَمِيلُ

جَوادٌ إِذَا اسْتَغْنَيْتَ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ ** وَعِنْدَ زَوَالِ الْمَالِ عَنْكَ بَخِيلُ

وَمَا أَكْثَرَ الإِخْوَانَ حِينَ تَعُدُّهُمْ ** وَلَكِنَّهُمْ فِي النَّائِبَاتِ قَلِيلُ

"কোনো কল্যাণ নেই ওই ব্যক্তির ভালোবাসায়, যে সুযোগ পেলেই রং বদলায়। যেদিকে বাতাস বয় তার গমন সেদিকেই হয়।

তার সম্পদের প্রয়োজন না হলেই সে দানশীল, আর তোমার সম্পদ না থাকলেই সে কৃপণ!

গণনা করলে দেখবে– ভাই-বন্ধুর নেই কোনো অভাব। মুসিবতে পড়লে দেখবে– বন্ধুর বড়োই অভাব।"

ইখওয়ানের ক্রমাগত বিপদ ও কঠিন পরীক্ষাগুলো অনেক বিস্ময়ের পর্দা উন্মোচিত করেছে। ইখওয়ানের বহু কর্মী এমন আছে– চাবুকের আঘাতে যাদের পুরো শরীর রক্তাক্ত হয়েছে, কিন্তু তারপরও তারা অন্যান্য কর্মীদের ব্যাপারে মুখ খোলেনি, যেন এভাবে তারা মৌনতার রোজা পালন করেছে। এমনও ঘটনা ঘটেছে যে, তাদের দীর্ঘক্ষণ চুপ থাকার কারণে শাস্তি পেতে পেতে তাদের প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে, তখনও তারা ছিল সন্তুষ্টচিত্ত; কোনো অভিযোগ, অনুযোগ তাদের ছিল না। তাদের সংকল্প ছিল– আমাদের কথার কারণে যেন কোনো ভাই শাস্তির শিকার না হয়।

কত তরুণ ওই সকল কর্মীকে মুক্ত করতে সাধ্যাতীত কষ্ট সহ্য করেছে, যাদের ব্যাপারে জানা ছিল যে, তাদের পরিবারের সদস্যসংখ্যা বেশি এবং উপার্জন কম। কত যুবক এমনও দেখেছি যে, নির্দোষ হিসেবে কারামুক্ত হয়েছে। তাদেরকে কেউ কখনও কোনো অপরাধে জড়াতে দেখেনি। কিন্তু তাদের ভাইদেরকে জেলে রেখে মুক্ত জীবন তাদের ভালো লাগেনি। ফলে তারা স্বেচ্ছা

www.bjilibrary.com

অনুদানের ভিত্তিতে ফান্ড সংগ্রহ শুরু করেন। সেই ফান্ড থেকে ওই সকল পরিবারে সহায়তা পাঠানো শুরু করেন, যারা তাদের কর্তাকে হারিয়েছে, ফলে আগে সচ্ছল থাকার পরও এখন অভাবের মুখে পড়েছে, অভিজাত হওয়ার পরও তারা এখন মানবেতর জীবনযাপন করছে। এভাবে তারা নিজেদেরকে সরকারের রোষানলে নিপতিত করে। অতঃপর জেল-জুলুম, শাস্তি, মামলা-হামলা আরও কত কি! এরপর কেউ আজীবন কারাদণ্ড ভোগ করেছে, আবার কেউ-বা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করেছে।

এ সকল মামলা-হামলা ইখওয়ানের সদস্যদের অন্যদের সাহায্য করা থেকে দমাতে পারেনি। প্রত্যেক ইখওয়ান কর্মীই নিজের ওপর আবশ্যিক দায়িত্ব মনে করে যে, তার ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে ভাইয়ের সন্তানেরা যেন কষ্ট ভোগ না করে, সে ব্যবস্থা তাকে করতে হবে।

কারার সেলগুলো প্রত্যক্ষ করেছে, পারস্পরিক সহায়তা ও অন্যকে প্রাধান্য দেওয়ার অসংখ্য অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, যা লিখে শেষ করা সম্ভব নয়। ধনাঢ্য পরিবারের সদস্যদের জন্য তাদের বাসা থেকে জেলখানায় পোশাক ও খাবার আসত। কিন্তু তারা অন্যান্য সঙ্গীদের মধ্যে সেগুলো বিতরণ করে দিত। কখনও সেগুলো থেকে অন্যদের মতো কিছু গ্রহণ করত, আবার কখনও কিছুই গ্রহণ করত না।

এ আত্মিক সম্পর্কের মূল্য ও ভ্রাতৃত্বের নিয়ামত কেবল তারাই বুঝবে, যারা জানে– কারাভ্যন্তরে ইখওয়ানুল মুসলিমিন ভিন্ন অন্যান্য লোকদের জীবনাচরণ কেমন হয়।

আমার এখনও সে সময়ের মনে পড়ে, ১৯৪৯ সালে যখন আমি হাকস্টেপ (Huckstep) কারাগারে বন্দি ছিলাম। একদল সাম্যবাদী লোক আমাদের পাশেই ছিল। আমরা দেখতাম– ছোটো ছোটো বিষয় নিয়ে তাদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যেত। তাদের প্রত্যেকেই ছিল আত্মকেন্দ্রিক। কারও জন্য বাহির থেকে কোনো জিনিস এলে কেবল সে-ই তা ব্যবহার করত। যে কামরায় তারা ঘুমাত, সেটিকে সেন্টিমিটার হিসেবে ভাগ-বণ্টন করে নিয়েছিল। প্রত্যেকে কেবল তার অংশটুকুই পরিষ্কার করত। এর চেয়ে কমও নয়, বেশিও নয়। তা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ লেগেই থাকত।

***

www.bjilibrary.com

উপসংহার

প্রিয় পাঠক! আপনি এ কথা মনে করবেন না যে, আমি দাবি করছি– ইখওয়ানুল মুসলিমিন হলো ফেরেশতার মতো পবিত্র অথবা নবিগণের মতো নিষ্পাপ! বরং যথার্থ কথা হলো– ইখওয়ানের সদস্যরা অন্যদের মতোই দোষে-গুণে মানুষ। তাদের মধ্যে অবশ্যই মানবীয় দুর্বলতা আছে। সে হিসেবে তারা কখনও ভুল করে, কখনও সঠিক করে। কখনও হোঁচট খায়, আবার উঠে দাঁড়ায়। তারাও এ নির্বাচিত উম্মতের অন্য সকল সন্তানের মতোই, আল্লাহ তায়ালা যাদের স্বীয় কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছেন–

...فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهٖ ۚ وَ مِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ ۚ وَ مِنْهُمْ سَابِقٌۢ بِالْخَيْرٰتِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ
ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ ﴿۳۲﴾

"অতঃপর তাদের কেউ নিজের প্রতি জুলুমকারী, কেউ মধ্যপন্থি এবং কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। আর এটিই মহা অনুগ্রহ।" সূরা ফাতির : ৩২

অতএব, যদি আপনি ইখওয়ানের এমন কোনো সদস্যও খুঁজে পান, যে ইসলামের নামটি ছাড়া আর কিছুই ধারণ না এবং কুরআনের চিহ্ন ছাড়া আর কিছুই চেনে না, তাতে আহামরি অবাক হওয়ার কিছু নেই। এ বিষয়টি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, যখন কয়েকটি অন্তর্বর্তী সময়ে প্রচুর মানুষ ইখওয়ানের কার্যক্রমে শামিল হয়েছে। বিশেষ করে পঞ্চম দশকের শুরুতে– যখন ইখওয়ানের তারবিয়াতের সক্ষমতা ও ধারণক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি লোক সংগঠনে যুক্ত হয়েছে। ফলে যথাযথ প্রশিক্ষণের অভাবে তাদের মান প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে। এদিকে দলে প্রবেশ করতে আগ্রহী লোকদের নিরাশ করে ফিরিয়ে দেওয়ারও সুযোগ ছিল না। কাজেই এ শ্রেণির লোকদের আচরণে এমন কোনো অসংগতি দৃষ্টিগোচর হতে পারে, যা একজন মুসলিমের জন্য সাযুজ্যপূর্ণ নয়। কারণ, সে যুগটিকে ব্যাধির চিকিৎসাকাল এবং সংস্কারের জন্য প্রশিক্ষণকাল হিসেবে গণ্য করা হয়, যেখানে ল্যাংড়া-খোঁড়া, সব ধরনের লোকের আগমন হতো, যাতে তারা সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়ে উঠতে পারে।

www.bjilibrary.com

আমরা ভুলব না যে, দলের উত্থানকালে তার আন্দোলনে এমন বহু লোকের আগমন হয়েছে, যাদের মধ্যে ছিল লোভী ও রুগ্‌ণ অন্তরের অধিকারীও, যাদের কারও কারও লক্ষ্য ছিল জাগতিক প্রসিদ্ধি ও সমৃদ্ধি অর্জন করা। তারা মুখে ঈমানের কথা বললেও তাদের হৃদয়ে ঈমান প্রবেশ করেনি। কোনো দাওয়াতি মিশন এ শ্রেণির লোক থেকে নিরাপদ ছিল না এবং কোনো সমাজই এ জাতীয় লোক থেকে মুক্ত থাকবে না। এমনকি নববি যুগে মদিনার সমাজেও না।

কাজেই যারা মনে করে বা দাবি করে– ইখওয়ানের আঙিনা সর্বপ্রকার দোষত্রুটি থেকে মুক্ত এবং শতভাগ পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, আমার মতে– তারা ইখওয়ানের পরিচয়, বাস্তবতা ও ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ। বেশির চেয়ে বেশি এতটুকু বলা যেতে পারে– ইখওয়ানুল মুসলিমিন সামগ্রিকভাবে সুস্থ চিন্তা, পরিচ্ছন্ন হৃদয়, পবিত্র আত্মা, মার্জিত চরিত্র, পরিশীলিত আচরণের অধিকারী হওয়া, আল্লাহর দ্বীনের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া, মানুষের কল্যাণ কামনা, ইসলামের প্রতি আত্মমর্যাদাবোধ ও তার পূর্বের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, ইসলামি আইন প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বদরবারে মুসলিমদের নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারে এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের প্রতিনিধিত্ব করে।

পাশাপাশি আমরা এ কথাও বলব যে, বিগত পঞ্চাশ বছর ধরে ইখওয়ান তারবিয়াত ও ব্যক্তি পরিগঠনের জন্য যেসব উপায় ও অবলম্বন গ্রহণ করেছিল, সেগুলো বহু বছর ফলদান করেছে এবং উপকারী বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু দীর্ঘকালের অনুশীলন ও অভিজ্ঞতার আলোকে এখন সেগুলোর মধ্যে অনেক কিছু নিয়েই পুনর্ভাবনার সময় হয়েছে। তাতে কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজন এখন সময়ের দাবি।

একটি দলের জন্য অর্ধশতাব্দীকাল অতিক্রান্ত হয়ে যাওয়া কোনো সাধারণ কথা নয়। ইতোমধ্যে আমাদের অত্র অঞ্চলসহ পুরো বিশ্বের পরিস্থিতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে, নতুন চিন্তার বিকাশ হয়েছে এবং মূল্যবোধে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

অতএব, দ্রুত পরিবর্তনশীল এ জগতে যেসব প্রাচীন রীতিনীতি অকাট্য নয়, তা প্রয়োজনহীন হয়ে পড়লে আঁকড়ে ধরে থাকা যৌক্তিক নয়। কেননা, ইসলাম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে বিশ্বাসী এবং উপায়-উপকরণের ক্ষেত্রে সামসময়িক ও গতিশীল।

وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

www.bjilibrary.com

পাঠসঞ্চয়

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

www.bjilibrary.com

প্রচ্ছদ প্রকাশন-এর প্রকাশিত বই

তাফসির		
০১.	যুবদাতুল বায়ান (১ম খণ্ড) সূরা ফাতিহার তাফসির	ড. আহমদ আলী
০২.	যুবদাতুল বায়ান (২য় খণ্ড) সূরা বাকারাহর তাফসির	ড. আহমদ আলী
সিরাত-নবিজীবন		
০৩.	নবিজীবনের সৌরভ	ড. নূরুদ্দিন ইতির অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
০৪.	প্রিয় নবি প্রিয় প্রতিচ্ছবি	খুররম মুরাদ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
০৫.	রাসূলুল্লাহর সাথে রোমাঞ্চকর একদিন	অধ্যাপক মফিজুর রহমান
০৬.	ছোটদের মহানবি	মীর মশাররফ হোসেন
০৭.	উম্মুল মুমিনিন (রাসূল সা.-এর স্ত্রীগণ)	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর ও মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
মনীষী/জীবন-কর্ম-চিন্তাধারা		
০৮.	খাদিজা বিনতে খুয়াইলিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
০৯.	আয়িশা বিনতে আবু বকর রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
১০.	সেনাপতি : খালিদ বিন ওয়ালিদ রা.	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ

www.bjilibrary.com

১১.	মুয়াজ্জিন : বিলাল রা.	বাপ্পা আজিজুল
১২.	উমর ইবনে আবদুল আজিজ	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান
১৩.	আলিম ও স্বৈরশাসক	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : আবুল হাসান
১৪.	আল্লামা ইকবাল : মননে সমুজ্জ্বল	সংকলন : আবু সুফিয়ান
১৫.	ইমাম হাসান আল বান্না : নতুন যুগের নির্মাতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : শাহাদাত হোসাইন
১৬.	দ্য ব্যালট অর দ্য বুলেট (ম্যালকম এক্সের জীবন ও বক্তৃতা)	অনুবাদ : সাইফুল্লাহ, জাওয়াদ, সালেহ সানাউল্লাহ
১৭.	সাইয়িদ কুতুব পরিবার	ড. আব্দুস সালাম আজাদী
১৮.	প্রেসিডেন্ট মুরসি : আরব বসন্ত থেকে শাহাদাত	সংকলন : ওয়াহিদ জামান
১৯.	হোয়াট আই বিলিভ (অত্মোপলব্ধির দার্শনিক বয়ান)	ড. তারিক রমাদান অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
ইতিহাস, সংস্কৃতি, সাহিত্য		
২০.	লস্ট ইসলামিক হিস্ট্রি (ইসলামের হারানো ইতিহাস)	ফিরাস আল খতিব অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
২১.	কারফিউড নাইট	বাশারাত পীর অনুবাদ : আনোয়ার হোসেইন মঞ্জু
২২.	মুসলিম সংস্কৃতি ও বাঙালি মুসলমান	ফাহমিদ-উর-রহমান
২৩.	ইসলাম ও শিল্পকলা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
২৪.	কারবালা ইমাম মাহদি দাজ্জাল গজওয়ায়ে হিন্দ	ড. ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর

www.bjilibrary.com

জীবনবিধান ইসলাম		
২৫.	জীবনবিধান ইসলাম	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
২৬.	ইসলামের ব্যাপকতা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : তারিক মাহমুদ
২৭.	ইমাম বান্নার বিশ মূলনীতির ব্যাখ্যা	ড. আবদুল কারিম যাইদান অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
২৮	তাকফির : কাফির ঘোষণায় বাড়াবাড়ি ও মূলনীতি	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : এনামুল হাসান
আত্মগঠন/আত্মপর্যালোচনা		
২৯.	মানুষ : মর্যাদা ও সৃষ্টির উদ্দেশ্য	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
৩০.	ইসলামিক ম্যানারস (জীবনঘনিষ্ঠ আদব-শিষ্টাচার)	আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩১.	দুঃখ-কষ্টের হিকমত	ইমাম ইযযুদ্দিন আবদুস সালাম ইমাম ইবনে কাইয়িম অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩২.	ইমাম বান্নার ওযিফা	ইমাম হাসান আল বান্না অনুবাদ : সাজ্জাদ হোসাইন খাঁন
৩৩.	ইমাম বান্নার পাঠশালা : ব্যক্তিত্ব ও সমাজ বিনির্মাণে ইখওয়ানের তারবিয়াত পদ্ধতি	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : সুলতানা শিফা
৩৪	পাবলিক ম্যাটারস (জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি)	ড. সালমান আল আওদাহ অনুবাদ : আলী আহমাদ মাবরুর
৩৫.	এইম ফর দ্য স্টারস	নোমান আলী খান, ইয়াসির ক্বাদি অনুবাদ : মোহাম্মদ সাইফুল্লাহ
দাওয়াহ		
৩৬.	অমুসলিম দাওয়াহ	সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী খুররম জাহ মুরাদ

www.bjilibrary.com

৩৭.	ফ্রম এমটিভি টু মক্কা	ক্রিস্টিয়ানা বেকার অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান
অর্থনৈতিক বিধান		
৩৮.	অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে যাকাতের ভূমিকা	ড. ইউসুফ আল কারযাভী অনুবাদ : ড. মাহফুজুর রহমান
রাষ্ট্রব্যবস্থা ও রাজনীতি		
৩৯.	ইসলামে রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনার মূলনীতি	মুহাম্মাদ আসাদ অনুবাদ : অধ্যাপক শাহেদ আলী
৪০.	দ্বীন কায়েমের নববি রূপরেখা	ডা. ইসরার আহমাদ অনুবাদ : ফাহাদ আবদুল্লাহ
৪১.	গণতন্ত্র : ইসলামী দৃষ্টিকোণ	ড. আহমদ আলী
৪২.	কল্যাণরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সা.	মিয়া গোলাম পরওয়ার
দাম্পত্য-জীবন		
৪৩.	লাভ এন্ড রেসপেক্ট (দাম্পত্য সুখের অজানা রহস্য)	ড. এমারসন এগারিচেস অনুবাদ : রোকন উদ্দিন খান

www.bjilibrary.com

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

ইলমি অঙ্গনে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে পরিচিত ও আলোচিত নাম। ইউসুফ আবদুল্লাহ আল কারযাভীর জন্ম ১৯২৬ সালে, মিশরে। পড়াশোনা করেছেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। বর্তমানে বসবাস করছেন কাতারে। পেশাগত জীবনের বড়ো অংশ কাটিয়েছেন কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায়।

ড. কারযাভীর বিশ্বব্যাপী পরিচিতির অন্যতম কারণ হলো তাঁর রচনাকর্ম। লিখেছেন শতাধিক বই। গবেষণা ও লেখায় পুনরাবৃত্তির চেয়ে তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন সামসময়িক সমস্যার সমাধানে। কখনও-বা পুরোনো বিষয়কে হাজির করেছেন নতুন বিন্যাস ও আঙ্গিকে। জীবনঘনিষ্ঠ বিষয়াদিতে গভীরতর আলোচনা ও ভারসাম্যপূর্ণ উপসংহারে পৌঁছতে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। উসতায কারযাভীর বইগুলো অনুবাদ হয়েছে পৃথিবীর বহুলকথিত প্রায় সব ভাষায়। বাংলায় প্রতিনিয়ত তাঁর নতুন নতুন অনূদিত বই প্রকাশিত হচ্ছে।

www.bjilibrary.com

জাকিয়া সুলতানা শিফা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের শিক্ষার্থী; দ্বিতীয় বর্ষে অধ্যয়নরত। জন্ম ২০০১ সালের ২৯ মে, নেত্রকোনা জেলায়। ২০১৫ সালে বেফাকুল মাদারিসিল আরাবিয়া কওমী বোর্ড থেকে দাওরা হাদীসে ৫ম স্থান অধিকার করেন। দাখিল ও আলিমে বোর্ড বৃত্তি পেয়ে উত্তীর্ণ হন।

সুলতানার শিফার পিতা লেখক ও সম্পাদক হিসেবে সুপরিচিত। তার উৎসাহে লেখালিখির সাথে সম্পৃক্ত হওয়া।

www.bjilibrary.com

ইখওয়ানুল মুসলিমিন বিশ ও একুশ শতকের ইসলামের পুনর্জাগরণের কিংবদন্তিতুল্য আন্দোলন। বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে এখনও মুসলিম বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবক আন্দোলন হিসেবে ইখওয়ান দৃশ্যপটে হাজির। প্রায় শত বছরের এই দীর্ঘ অভিযাত্রায় ইখওয়ানের অবদানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। কিন্তু ইখওয়ানের সবচেয়ে বড়ো অবদান কী?

ইখওয়ানের আদর্শ ও আন্দোলনের শীর্ষ ভাষ্যকার উসতায ইউসুফ আল কারযাভীর দৃষ্টিতে ইখওয়ানের সবচেয়ে বড়ো অবদান হলো– এমন এক নবপ্রজন্ম গড়ে তোলা, যারা ইসলামকে যথার্থরূপে অনুধাবন করে, ইসলামের প্রতি গভীর বিশ্বাস পোষণ করে, যারা ইসলামের কালিমাকে সমুন্নত করতে প্রাণপাত প্রচেষ্টা চালায়, যারা মুসলিম উম্মাহকে ঐক্যবদ্ধ করতে কাজ করে। এই নবপ্রজন্মই সারাবিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সাথে ছড়িয়ে দিয়েছে ইসলামের পুনর্জাগরণের সবুজ স্বপ্ন। উসতায কারযাভী মনে করেন, এই নবপ্রজন্ম গড়ার সফলতার মূল উপাদান হচ্ছে– ব্যাপকতর, ভারসাম্যপূর্ণ, বাস্তবানুগ ও অনিন্দ্য সুন্দর তারবিয়াত পদ্ধতি।

এই বইয়ে উসতায কারযাভী ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তালিম-তারবিয়াত পদ্ধতিকে উপস্থাপন করেছেন। ব্যাখ্যা করেছেন এই পদ্ধতির ইলমি ভিত্তি। এই তালিম-তারবিয়াত কেমন মানুষ গড়ে তুলেছে এবং ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও জাতীয় জীবনে কেমন প্রভাব বিস্তার করেছে, তাও তিনি তুলে ধরেছেন।

ইখওয়ানুল মুসলিমিনের তারবিয়াত পদ্ধতি সম্পর্কে জানাটা আমাদের জন্য বিভিন্ন দিক থেকে উপকারী। এর মাধ্যমে আমরা ইসলামি আন্দোলনের বৈশ্বিক অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ হতে পারি। নিতে পারি তাদের শিক্ষণীয় ঘটনাবলি থেকে প্রেরণার উপকরণ। আর ভৌগোলিকভাবে এত দূরবর্তী অবস্থানের পরও তাদের সাথে আমাদের মিলগুলো আমাদের হৃদয়ে ছড়িয়ে দেয় ভ্রাতৃত্বের উত্তাপ।

প্রচ্ছদ প্রকাশন